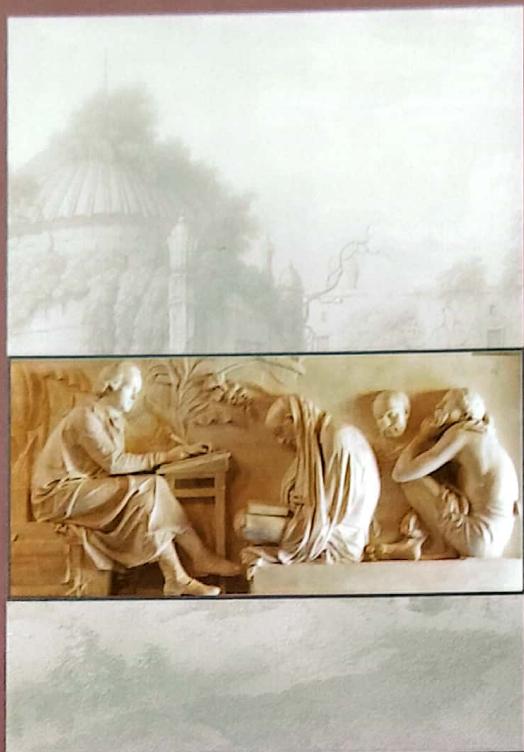


বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা

ফয়েজ আলম





ঐতিহাসিক কালের শুরু থেকে বাংলা শতকের গোড়ায় সেন দখলাভ্যান পর্যন্ত বাংলাদেশ ছিলো একটি বৌদ্ধপ্রধান দেশ। বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী অস্ত্রিকদেরসহ মুন্ডা, সাঁওতাল, কোল, ভীল, মালপাহাড়ি, ভূমিজ নামে পরিচিতি মানবগোষ্ঠীগুলোর সমব্রয়ে গড়ে উঠা আদি বাঙালিরাই ছিলো এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ধর্মের নিরিখে বৌদ্ধরাই ছিলো বাঙালি জনসমাজের মূল শ্রেণি, এর পর জৈন, তিন নম্বরে হিন্দু। উশি শতকে 'বাংলার নবজাগরণ' নামের আড়ালে ঘটে যাওয়া হিন্দু-পুনর্জাগরণের কালে বৌদ্ধবাংলার ইতিহাস চাপা দিয়ে লেখা হয় বাংলার আর্যায়ন ও আদর্শ আর্য-হিন্দু জনসমাজের কঞ্চিত ইতিহাস।

হিন্দু-পুনর্জাগরণের জোশে বাঙালির ইতিহাসের বেশ কিছু সত্য চাপা দিয়ে তৈরি হয় পক্ষপাতদুষ্ট আনুমানিক বয়ান, যেগুলো এখনো আমাদের জ্ঞানচর্চায় ইতিহাসের সত্য হিসাবে পোক হয়ে বলে আছে। বাঙালির বক্তৃনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চার পথে দুর্মর বাধা হয়ে থাকা অইসব আনুমানিক বয়ানের অনৈতিহাসিকতা এবং পক্ষপাতিত্বের স্বরূপ খুলে খুলে দেখিয়েছেন লেখক প্রামাণিক প্রাথমিক তথ্যের ভিত্তিতে। এ বই প্রচলিত ইতিহাস চিত্তায় এক গভীর সৃষ্টিমূখ্য ভাঙচুরের সূচনা বলে মনে হয়।

সতকীকরণ

এ বই বাঙালির ‘মায়ের ভাষা’ অর্থাৎ বাংলাদেশের সর্বাঞ্চলীয় কথ্যরীতিতে লেখা, লেখক যেটিকে ‘মান কথ্যবাংলা’ থাকেন। বর্তমানে প্রচলিত সংস্কৃতানুযায়ী ‘বাংলা ব্যাকরণের’ কচকচানির সুযোগ এখানে নেই, অভিধানের মাতৰণিও নেই। মানুষের মুখের উচ্চারণ অনুযায়ী বানান লেখা হয়েছে। পাঠককে তা জানিয়ে রাখলাম।

- প্রকাশক

বাঙ্গালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা

ফয়েজ আলম

প্রকাশন কর্তৃপক্ষ মন্তব্য প্রকাশন
মুদ্রণ মুদ্রণ

প্রকাশন
মুদ্রণ মুদ্রণ
কর্তৃপক্ষ

প্রকাশন

মুদ্রণ

কর্তৃপক্ষ



লেখক এবং প্রকাশকের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে এই বইমের কোনো অংশেরই কোনোরূপ পুনরূপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না। কোনো ধার্মিক উপায়ের (গ্রাফিক্স, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনো মাধ্যম; যেমন- ফটোকপি, টেপ, ডিস্ক বা পুনরূপাদনের সুযোগ সংবলিত তথ্য সংযোগ করে রাখার কোনো পদ্ধতির) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না। এই শর্ত লজিভত হলে উপর্যুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

বাঙালির ইতিহাস চর্চার পথের কাঁটা ফয়েজ আলম

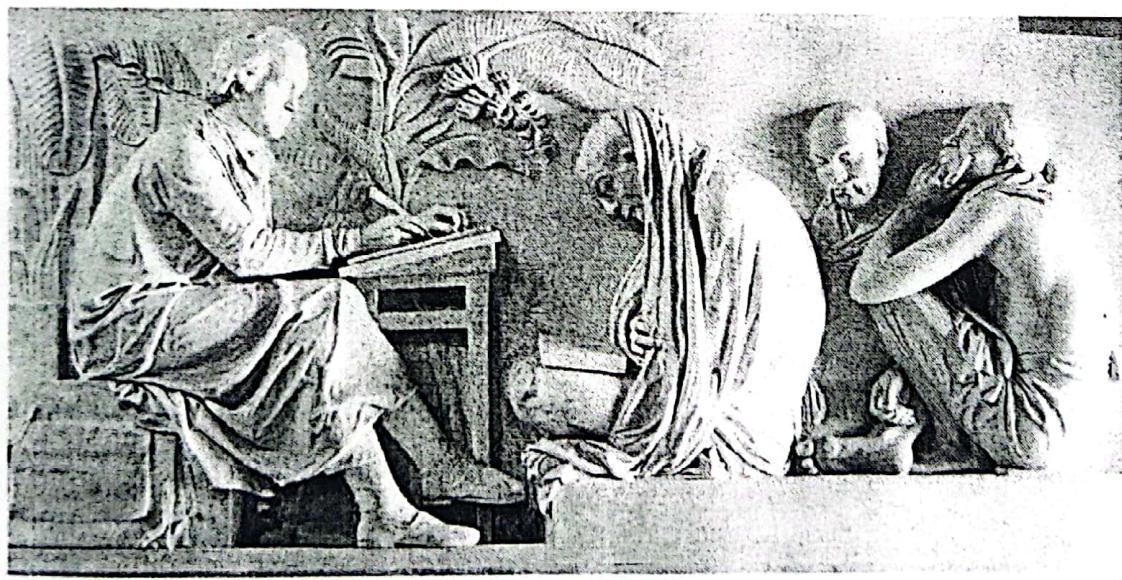
প্রথম প্রকাশ
অমর একুশে বইমেলা ২০২৪
© লেখক

প্রকাশক
মাহ্দী আনাম
ঘাসফুল
১১/১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রচ্ছদ
ইভান রেহান
অক্ষর বিন্যাস
ঘাসফুল কম্পিউটার্স
মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৪৮/৩ জাস্টিস লালমোহন দাস লেন, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০
মূল্য: ২৩০ টাকা

ওয়েব অ্যাড্রেস: www.ghasfulbd.com

Bangalir Itihas Chorchar Pother Kanta by Fayaz Alam
Published by Mahdi Anam of Ghasful
11/1 Islami Tower, Banglabazar, Dhaka-1100
Cover Designed by Evan Rehan
Price: 230.00 only US \$ 8
ISBN: 978-984-98968-0-7



প্রচন্দের ছবি

দাকার ছোট কাটৱার ধোঁয়াশা পটভূমিতে ইউনিভার্সিটি কলেজ চ্যাপেল, অফিসের উইলিয়াম জোনস মেমোরিয়াল ভাস্কুলের ছবি। বিষয়, কলিকাতায় টেবিলে বসে লিখছেন উইলিয়াম জোনস, নিচে তার পায়ের কাছে বসা তিন ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সংকৃতে লেখা পুঁথি অবলম্বনে হিন্দু আইনের ব্যাখ্যা দিয়ে সহায়তা করছেন। ছবিটি বাঙালিদের প্রতি উপনিবেশক ইংরেজদের ঘৃণ্ণ, জঘন্য, অপমানকর আচরণের নমুনা।

ভূমিকা

উনিশ শতকের কলিকাতায় যে হিন্দুত্ববাদী পুনর্জাগরণ ঘটাটা যায় ছোট একদল ব্রাহ্মণবাদী লেখক-বুদ্ধিজীবীর নেতৃত্বে তার সাথে কোনো সম্পর্ক আছিল না মূল বাঙালি জনগোষ্ঠীর- বিপুল সংখ্যাক হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ আমজনতার। তবু এই সংখ্যালঘুরাই সাম্প্রদায়িক আবেগে উদ্বৃদ্ধ হয়া ধর্মীয় পুরান, ধর্মীয় লোককাহিনীর অনেক গালগঞ্জের ইতিহাস হিসাবে চালায়া দিতে পারছে আমাদের দেশের সাধারণ মানুষের জানবুঝের জগতে। আর, যুগে যুগে তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা সেইগুলারেই পুনরুৎপাদন করছে, বানোয়াট বয়ানগুলারে যাচাই না কইরাই। এইসব বানোয়াট, সাম্প্রদায়িক আবেগপ্রসূত বয়ান এখন ইতিহাসের অংশ হিসাবে জারি থাইকা আমাদের যৌথ সামাজিক-সাংস্কৃতিক জীবনীশক্তিরে একটানা কাইটা যাইতেছে গোপন ঘুনের মত।

আমি চেষ্টা করছি এই সব আনুমানিক পক্ষপাতদুষ্ট বয়ানগুলারে দাগ দেয়ার আর সঠিক নিরপেক্ষ ইতিহাসের চিনাসগুলা দেখায়া দেয়ার। যাতে চাইলে নিরপেক্ষ ইতিহাসের খোঁজ করতে পারে পরের প্রজন্মের মানুষেরা। সমাজের সামিল একজন হিসাবে যে দায়বোধ তার তাড়না থাইকা এইটুকু করা। এই লেখা থাইকা কেউ সঠিক দিশা পাইলে কষ্টটা কামে লাগবে। সাবধান থাকা সত্ত্বেও কিছু বানান ভুল রয়া গেল কি না! সেইজন্য পড়ুয়াদের কাছে আগাম মাফ চায়া নিলাম।

গবেষনা ও লেখার বিভিন্ন পর্যায়ে উৎসাহ-পরামর্শ দিয়া চাঙা রাখছেন কবি জহির হাসান, কবি ও সাংবাদিক রাজু আহমেদ মামুন, কবি ইকতিজা আহসান, ঐতিহ্য নেতৃকোনার প্রতিষ্ঠাতা এডভোকেট আবদুল হান্নান রঞ্জন, সহকর্মী তানভীর হাসনাইন মঙ্গেন, মাকসুদুর রহমান, কিতাব আলী মঙ্গল। আর, কাজটা শেষ করার ব্যাপারে সহধর্মিনী সুলেখিকা জোহরা পার্কলের অবিরাম তাগিদ তো ছিলই। এদের সবাইরে ধন্যবাদ জানাই।

ফয়েজ আলম
সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪

এক

শদেড়েক বছর আগে ১২৮৭ সালের অগ্রান মাসের বঙ্গদর্শন পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আফসোস কইরা লেখেন ‘বাঙালার ইতিহাস নাই . . .’। ইতিহাস লেখার বিরাট এক প্রস্তাৱও হাজিৱ কৱেন তিনি। সেইখানে বলেন বাংলার ইতিহাস: কে লিখিবে? তুমি লিখিবে, আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙালী তাহাকেই লিখিতে হইবে (বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৯১: ৩৩৭)।

ঈসায়ী হিসাবমতে সময়টা ১৮৮০ সালের শেষ। সেইযুগে আলবিরুনির কিতাব-আল-হিন্দ, মিনহাজ-ই-সিরাজের (১১৯৩ - ?) তবকাত-ই নাসিরী, জিয়াউদ্দিন বারানীর (১২৮৫-১৩৫৭) তারিখ-ই-ফিরোজশাহী, খাজা নিজামুদ্দিন আহমাদের (১৫৫১-১৬২১) তবকাত-ই-আকবরী, মুহাম্মদ কাসিম হিন্দুশাহ আন্তারাবাদীর (১৫৭০-১৬২০) তারিখ-ই-ফিরিশতা, গোলাম হোসেন সলীমের (?-১৮১৮) রিয়াজুস সলাতীন, সৈয়দ গোলাম হোসেন তবাতবাসীর (১৭২৮- ?) সিয়ার-উল-মুতাখ্খেরীন, চার্লস স্টুয়ার্টের (১৭৫৮-১৮২৮) *The history of Bengal, From the First Mohammedan Invasion until the Virtual Conquest of that Country by the English AD 1757*, জন ক্লার্ক মার্শম্যানের (১৭৯৪-১৮৭৭) *Outline of The history of Bengal* বইগুলা মোটামুটি জনপ্রিয়। কোনোটাতেই বাঙালির পুরা সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস নাই। তবে রাজনৈতিক ইতিহাস হিসাবে এইসব বই সেইসময় বেশ গ্ৰহণযোগ্য আছিলো।

এইগুলার সাথে অন্যান্য উৎসের তথ্য মিলায়া দিনে দিনে বাংলা ও বাঙালির বিস্তারিত ইতিহাস লেখার কাজটাও তখন চলতেছে। তাৱপৱে বঙ্কিমবাৰু কেন আফসোস কৱলেন ‘বাঙালার ইতিহাস নাই’? বিস্তারিত আলাপে গেলে দেখা যাবে, বঙ্কিমের এই আফসোসের কাৱন আৱ তাৱ পৱিনামেৰ মধ্যে মিইশা আছে বাঙালির ইতিহাস চৰার একটা গুৱৰতৰ সমস্যা।

বঙ্কিমচন্দ্রের গভীৰ আফসোস আৱ বেপৰোয়া তাড়নাৰ দাম দিছিলেন কলিকাতাৰ সেই কালেৱ লেখকৰা। মালকোচা মাইৱা ইতিহাস লেখায় ঝাঁপায়া পড়ছিলেন অনেকে। এৱপৱ প্ৰায় দেড়শ বছৰ বাংলা আৱ বাঙালিৰ ‘ইতিহাস’ লেখা হইছে। হয়ত বঙ্কিমেৰ বুদ্ধিৰ সবক নিয়া ‘তুমি, আমি, সকলেই’ লেখছে। লেখতে লেখতে ইতিহাসেৱ বইয়েৱ স্তুপ জমছে। এৱপৱে আমৱা যদি বলি, বাঙালিৰ ইতিহাস নাই, তাইলে এই বলাৱ যুক্তিমাফিক এবং বাস্তব কৈফিয়ত দেয়াৱ দায় পার

হওয়া মুশকিল। বরং ঠিক কইরা বলতে গেলে বলতে হয়, বাংলা আর বাঙালির ইতিহাস উনিশ শতকের ধৰ্মীয় উন্নাদনার ময়লা-আবর্জনায় ভৱা। যুগে যুগে আমাদের বহু নির্বোধ লেখক-বুদ্ধিজীবী-ইতিহাসকার ইতিহাস চৰার নামে সেই ময়লা-আবর্জনা মিশানো ইতিহাসেই আবার নিজ নিজ ভাষায় নতুন কইরা লেখতেছেন মাত্র। এইভাবে দিন দিন আরো বেশি ময়লাছয়লার নিচে চাপা পড়ছে ইতিহাসের আসল সত্য। আমার এই লেখা ইতিহাস উন্দারের কাম না; কেবল ধর্মের ময়লা আবর্জনার চেহারা আর আসল ইতিহাসের চিনাসগুলা দেখায়া দিতে পারব আশা করতেছি।

ইতিহাস কি, এই প্রশ্ন নিয়া অনেক চিন্তাভাবনা আর বাহাস হইছে, এখনো হইতেছে। ইতিহাস নামে গত সময়ের যে বিবরন তা প্রভাবিত করে আমাদের সময়রেও। ইতিহাসের শিক্ষা, দর্শন, আবেগ, বেদনা, বাসনা অনেক সময়ই সামনের পথের চিনাস হয়া উঠে। আমরা যদি বর্তমানে দাঁড়ায়া ঠিক করি আগামীতে কোন দিকে হাঁটব তাইলে সেই সিদ্ধান্ত বা মতরে জনমত হিসাবে খাড়া করার জন্য অনেক সময় ইতিহাসের সায় দরকার হয়। এইখানেই আসে ইতিহাসকারের দেখার ধরন আর তার সামাজিক অবস্থানের কথাটা। যিনি ইতিহাস লেখতেছেন তিনি কোন সমাজের মানুষ? সমাজে ধর্ম বা সংস্কৃতি কিংবা সহায়সম্পত্তি আর ক্ষমতাভিত্তিক যে ভাগাভাগি আছে তার কোন ভাগের সাথে তার থাকা আর চলাফেরা, কোন ভাগের সাথে মনের মিল? কোন সমাজের দিকে তার মনের টান? তিনি কি সমাজের সকলের সাধারণ সুখদুখের বয়ান দেন, নাকি নির্দিষ্ট একটা মেলের? যদি কোন ছোটো রক্ষণশীল মেলের মানুষ হন তিনি তাইলে তার ইতিহাস পড়ায় সেই মেলের পক্ষ ধরার ভয় থাকে। গত সময়ের সব কথা তার কাছে ইতিহাস হিসাবে জরুরি মনে নাও হইতে পারে।

আরেক কথা হইল, ইতিহাসের যে বয়ান লেখা হবে তা কোনখানে পাওয়া গেল। সাধারণত পুরানা কালে লেখা নানান কাহিনী, কাব্য, ধর্মবই, খুদাইলেখা (ইনক্রিপশন), প্রত্ন নির্দশন যেমন মাটির নিচে চাপাপড়া পুরানা মুদ্রা, সাংসারিক জিনিষপত্র, বাড়ি বা বাড়ির চিন্মুক, এইসবের থাইকা ইতিহাসের মালমশলা জোগাড় হয়। ইতিহাসকার যদি নিরপেক্ষ না হন তাইলে তিনি ইতিহাসকে যেভাবে দেখতে চান সেইমত তার সায় খুঁজবেন মালমশলার মধ্যে। এইগুলা থাইকা কেবল সেইসব জিনিষ বা খুদাইলেখার সাবুদ হাজির করবেন যেগুলা তার মনে তৈরি হয়া থাকা ইতিহাসের সমর্থন করে। বাকি জিনিষপত্র তার কাছে মূল্য পাবে না। আবার খুদাইলেখা ব্যাখ্যা দেয়ার সময়েও থাকতে পারে পক্ষপাতিত্ব।

প্রাচীন সময়ের ইতিহাস লেখার দুই নম্বর সমস্যাটা হইল সচরাচর অই সময়ের ধারাবাহিক বিবরন পাওয়া যায় না। কোন একটা তামার পাতে বা খাম্বার গায়ে কিংবা

মসজিদ মন্দিরের বেড়ার খুদাইলেখায় উল্লেখ থাকে কোন্ সুলতান বা সিপাহশালার বা মনসবদারের আদেশে এইটা বানানো হইছে। সঙ্গে থাকে সেই সুলতানের কিছু বংশ পরিচয় আর বেডাগিরির কথা। একই শাসকের উল্লেখ থাকতে পারে ভিন্ন ভিন্ন এইরকম অনেক খুদাইলেখায়। এইগুলা হয়ত বাংলাদেশে পাওয়া গেল। আবার বিহারের এক জায়গায় সেইখানকার একইকালের কোন সুলতানের খুদাইলেখায় বেডাগিরির বিবরনে পাওয়া গেল যে, বাংলার কোন এক সুলতান তার ভয়ে যুদ্ধক্ষেত্র ছাইড়া ডরঞ্চা হরিনের মত দৌড়ায় পলাইছিল। দেখা যাইতেছে খুদাইলেখায় বাংলার সুলতানের পলায়া যাওয়ার কথা আছে, কিন্তু এতে বাংলা রাজ্য বিহারের অধীনে আসছিল এমন কথা নাই। যুদ্ধের সময় এবং পরিনামও বলা হয় নাই। তাই এ ধরনের লেখার অর্থ করা উচিত এমন: ‘দুই দেশের মধ্যে ছোটখাট যুদ্ধ হইছিল মনে হয়। এতে কোন পক্ষই ঠিক জিতে নাই। যদিও বিহারের সুলতানের নাম ফাটানোর জন্য বলা হইছে যুদ্ধের ময়দান থাইকা বাংলার সুলতান পালায়া গেছিল। কেন যুদ্ধ হইছিল বা কে আগে আক্রমন করছিল জানা যায় না।’- এইটাই হইল সঠিক নিরপেক্ষ তাফসির। কিন্তু বিহারের কোনো ইতিহাস লেখক যদি তার দেশের পক্ষ ধরেন তাহলে হয়ত লেখবেন: ‘সুলতান অমুকের সময় বিহার খুব শক্তিশালী আছিল। বিহারের সাথে বাংলার যুদ্ধে বাংলার সুলতানের বাহিনী লেঙ্গুর তুইলা পলায়া গেছিল। এতে মনে হয় বাংলা রাজ্য বিহারের শ্রেষ্ঠত্ব মাইনা নেয়। এইসব কারেন আশপাশের রাজ্যগুলা বিহার রাজ্যের সমীহ কইরা চলত বইলা মনে হয়।’- এই তাফসিরটাই হইল পক্ষপাতদুষ্ট তাফসির। বিহার রাজ্য সম্পর্কে যেসব কথা খুদাইলেখায় নাই বা তেমন ইঙ্গিতও করে না, সেই সব কথা বলা হইছে অনুমানে, যে অনুমানের ভিত্তি হইল বিহারের সাথে কোন এক যুদ্ধে বাংলার সেনবাহিনীর সাফল্য লাভ না করা।

তাছাড়া, এইরকম তথ্য পাওয়া গেলেই তারে ইতিহাস বলা যায় না। এইখানে সেই যুদ্ধের সময়, কারন, জায়গা, ফলাফল নিয়া কথা নাই। দুই দেশের শাসন ও সমাজমেলের বিবরনও গরহাজির। ইতিহাসকারের কাজ হইল এইরকম আরো তথ্যের খবর কইরা সেইসবের ইশারা থাইকা একটা যৌক্তিক বিবরন খাড়া করা, যা যোল আনা নিরপেক্ষ হইতে হবে। অর্থাৎ ইতিহাসকার সব তথ্যের নিরপেক্ষ তাফসির তৈয়ার করবেন।

এইখানেই সমস্যার সুযোগ থাইকা যায়। যিনি ইতিহাস লেখেন তিনি নিরপেক্ষ তাফসির দিতে পারেন, আবার তৈয়ার করতে পারেন তার সুবিধামত কোনো তাফসির। নিজের জাতি বা ধর্ম বা গোত্রের অহংকার করতে সুবিধা হয় তেমনভাবে ব্যাখ্যা করতে পারেন ইতিহাসের মাশমশলার। বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে এই ঘটনাটাই ঘটছে। ইতিহাস লেখকরা মনের বাসনামত ইতিহাসের সম্মানে অনেক

ক্ষেত্রেই প্রাণ্ত তথ্য-উপাত্তের এমন ব্যাখ্যা দিছেন যারে কোনোমতেই নিরপেক্ষ বলা চলে না। তাফসির তৈরির এইরকম ব্যক্তিগত-মেলগত বোঁক ও রাজনীতি সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে বাংলাদেশের ইতিহাস চর্চার।

আসলে, বাঙালি ও বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার কাজে পীর-মুর্শিদ বইলা নাম কামাইছেন এমন ইতিহাস লেখকদের প্রায় কেউ-ই নিজ নিজ মেলের স্বার্থের কথা ভুলতে পারেন নাই। ফলে তাদের ইতিহাস হইছে একচোখা, ধর্ম বা সংস্কৃতি নাইলে মেলের স্বার্থদোষে দুষ্ট। গত দেড়শ বছর ধইরা বাংলা আর বাঙালির ইতিহাস হিসাবে যা লেখা হইছে তার প্রায় সবই নানা ভাবে এই দোষে দোষী। তাই, যদি বন্তনিষ্ঠ ইতিহাসের মানদণ্ড করি আর দুএকটা নজিররে ব্যতিক্রম ধরি, তাইলে বলতেই পারি বাঙালির নিরপেক্ষ ইতিহাস নাই। যা আছে তা হইল কওমি পক্ষপাতিত্ব, তথ্যের ভুলভাল ব্যাখ্যা, ভিনদেশ ও জাতের ইতিহাসের সাথে মিলায়া দেশের ইতিহাস রচনার যুক্তিছাড়া উন্নাদনা, অতীতের বিকৃত বিবরন ও তার পক্ষপাতদুষ্ট তাফসির, যার বড় একটা অংশ ময়লাছয়লা প্রায়।

আদি যুগের ইতিহাস লেখার জন্য যা পাওয়া গেছে তার বেশির ভাগই অই খুদাইলেখা আর বিদেশী লেখকদের বইয়ে এইখানকার কিছু বিবরন। তবে মধ্যযুগের রাজনৈতিক বয়ান পাওয়া গেছে যথেষ্ট। তুর্কি, আরব ও মধ্যএশীয় যোদ্ধারা এ অঞ্চলে আসার সময় সঙ্গে নিয়া আসছিলো বড় বড় রাজনৈতিক ঘটনার বিবরন লেইখা রাখার রেওয়াজ। পাকিস্তান, ভারতে, বাংলায় কোন সময় কোন সুলতান যুদ্ধ করেন এবং কোন এলাকা জয় করেন, সেইখানে কারে কারে শাসন ক্ষমতা দিয়া যান, সেইখানকার মানুষ কি রকম, আবহাওয়া কি রকম, এই জাতীয় বিবরন তারা লেইখা গেছেন, যা প্রকৃত অর্থেই ইতিহাস। এইগুলাই এই অঞ্চলের ইতিহাসের প্রথম নজির।

ইংরেজ উপনিবেশের আমলে এইসব বিবরন পইড়া পাক-ভারত-বাংলা অঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস জানতে পারেন ইংরেজ প্রশাসক ও নয়াশিক্ষিত বাঙালিরা। কিন্তু এইখানে দুইটা সমস্যা দেখা দেয়। এক, এইগুলা ফারসি ভাষায় লেখা, সকলে পড়তে পারত না; দুই: এইগুলা কেবল মুসলমান শাসকদের দেশ জয়ের বিবরনে ভরা এবং যারা পরাজিত তারা সবাই হিন্দু ধর্মের মানুষ। এই পরিস্থিতি বাঙালির ইতিহাস রচনায় পয়লা টানাপোড়েনের জন্য দেয়, মজুদ থাকে ইতিহাস লেখার কাজে ধর্মের মাতৃকরি করার উপযোগী অবস্থা হিসাবে।

সেই সময়ের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের রোখ কোনদিকে ছিলো সেইটাও দেখা দরকার। ইংরেজরা ক্ষমতা পাওয়ার পর আর্থসামাজিক অবস্থার বিরাট রদবদল আরম্ভ হয়। প্রথমে মুসলমানের হাত থাইকা খাজনা আদায়ের ক্ষমতা নিয়ে নেয় ১৭৬৫ সালে, ১৭৭২ সালে শাসন ক্ষমতাও। একজন গভর্নর জেনারেল নিয়োগ

করা হয় দেশ শাসনের জন্য। ইংরেজের কর্মচারী হিসাবে হাতে গনা কয়েন্তে মুসলমান বড় বড় পদে টিইকা আছিলো আরো কিছু দিন। ১৮০০ সালের আগেই জরুরি সব কাজ থাইকা নাই হয়া যায় মুসলমানরা। ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এদের উপর নির্ভরশীল নিচের দিকের মুসলমানরাও। ১৭৯৩ সালে ও ১৮১৯ সালে আইন কইরা প্রায় সব লাখেরাজ সম্পত্তি কাইড়া নেয়ায় নিতান্ত গরিব অবস্থায় পড়ে হাজার হাজার পরিবার। লাখেরাজী জমির উপর নির্ভরশীল মসজিদ, মসজিদ, মাদ্রাসা, পাঠাগার, বিনাপয়সার সরাইখানা, দাওয়াখানা, জনকল্যানমূলক নানা প্রতিষ্ঠানের নামে থাকা বিনাখাজনার জমি ছিনায়া নেয়ায় তার অনেকগুলা বন্ধ হয়া যায়। ফলে বেকার হয় এইসব প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত বিপুল সংখ্যক মুসলমান। এইভাবে পঞ্চাশ বছরের মধ্যে মুসলমান সমাজের বেশিরভাগই নিতান্ত গরিব মানুষে পরিনত হয়।

এইদিকে, আগের মত বিনাপয়সার পড়াশোনার সুযোগ নাই। ইংরেজের চালু করা ব্যবস্থায় পড়াশোনা করতে হইলে টাকা দরকার। ততোদিনে সেই আর্থিক সঙ্গতি হারাইছে অধিকাংশ বাঙালি মুসলমান পরিবার। আবার, ইস্কুল, শিক্ষা বোর্ড, ছাপাখানা সব ব্রাক্ষন্য হিন্দুদের দায়িত্বে থাকায় ইস্কুলে পড়ার বইপত্রের মধ্যে হিন্দু পুরানকাহিনি, ধর্মীয় লোককাহিনি, হিন্দু ধর্ম ইত্যাদি নিয়া লেখা বইয়ের সংখ্যা বেশি। ফলে যে ইস্কুলে সেইসব পাঠ্যবই পড়ানো হইত সেইখানে মুসলমানরা পড়তে না চাওয়া খুব স্বাভাবিক।

আরেক বিপদ হইল, সাধারণ মুসলমান জনগোষ্ঠীর একচ্ছত্র মাতবর হয়া দাঢ়ায় এইদেশে দেশান্তরী উর্দুভাষী ভারতীয় আশরাফ মুসলমানরা। তারা বাংলাভাষী না, বাংলা ভাষার সাথে তাদের মায়ার সম্পর্কও থাকার কথা না। বাংলাদেশের মুসলমানদেরকে তারা উক্ফানি দেয় ইংরেজের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা থাইকা দূরে থাকার জন্য। আর্থিক অনটন, স্কুলের পড়ায় হিন্দুধর্মের বইপত্রের সংখ্যাধিক্য এবং উর্দুভাষী ভারতীয় মুসলমানদের প্ররোচনা- প্রভৃতি কারনে বাংলাদেশের মুসলমানরা ইংরেজের পরিচালিত শিক্ষা ব্যবস্থা থাইকা দূরে থাকতে বাধ্য হয়। ফলে বাংলা ও ইংরেজি উভয় শিক্ষায় পিছায়া পড়ে তারা।

বৃটিশ উপনিবেশ কায়েম হওয়ার পর ইংরেজরা সহযোগী হিসাবে বাইচা নেয় তাদের সাথে সম্পর্কিত তথাকথিত উঁচা জাতের হিন্দুদেরকে। এই ক্ষুদ্র ব্রাক্ষন্যবাদী গোষ্ঠীটি আগে মুসলমান প্রশাসক-কর্মকর্তাদের মোসাহেবি করতো। পরে ইংরেজদের হাতে ক্ষমতা পড়লে খাপ খাওয়ায় নিতে সময় লাগে না তাদের। এর ফলে আর্থিক কামানির সুযোগ পাওয়া যায়। আর, সাড়ে পাঁচশ বছরের মুসলিম শাসনে জমা হওয়া ক্ষেত্র-দুর্ক্ষ-ঘৃনা জাহির করার মওকা পায়া কৃতজ্ঞ বোধ করে তারা। কৃতজ্ঞতার ভাষা অনেক সময় হয়া উঠে শর্তহীন গোলামির ভাষা। কেউ কেউ সেইটা খোলাখুলি

প্রকাশও করেন। যেমন রামমোহন রায় প্রেস রেগুলেশনের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের রাজার কাছে এক আবেদনে লেখেন:

ত্রিসব অত্যচারীর (মুসলমানদের) জোয়ালটা ভাইসা ফেলা আর নির্যাতিত হিন্দুদেরকে আশ্রয় দেয়ার জন্য ভগবান তার অসীমা দয়ায় শেষ পর্যন্ত ইংরেজদেরকে উক্তায়া দিছেন। ... (আমরা) আপনার কর্তব্যপরায়ন প্রজারা ইংরেজদেরকে বিজেতা মনে করি না, মনে করি (আমাদের) বাঁচাইনাঅলা। আপনারেও আমরা কেবল রাজা ভাবি না, আমাদের বাঁচাইনাঅলা আর, বাপের মত দেখি (Rammohon Roy, 1885: 440)।

এই জায়গার ভাষার দিকে খেয়াল দেয়া দরকার একটু: ‘আমরা. . . ইংরেজদেরকে বিজেতা মনে করি না’ এবং ‘আমাদের বাঁচাইনাঅলা আর বাপের মত দেখি’। স্বার্থের প্রশ্নে আত্মসম্মান বা জাতিগত সম্মান যেন কিছু না। এইভাবে এক জায়গায় আইসা মিহলা যায় উপনিবেশক ইংরেজের উদ্দেশ্য আর তাদের সহযোগী ব্রাক্ষন্যবাদী ক্ষুদ্র গোষ্ঠীটির স্বার্থ।

শাসনকেন্দ্র কলিকাতায় তখন ব্যবসা, চাকরিসহ নানা ধরনের পেশায় আর্থিক উন্নতির সুযোগ তৈরি হইতেছে। আশপাশের অঞ্চল থাইকা লোকজন আইসা ভড় করতেছে কলিকাতায়। ইংরেজরা মুসলমানদেরকে খুব একটা বিশ্বাস করত না। আবার, মুসলমানরা ছিল ক্ষমতা-হারানো শাসকের জাত। তাদের পক্ষে হঠাতে কইরা ইংরেজের গোমন্তাগিরি চামচামি করাও সম্ভব হয় না স্বাভাবিক অংহবোধের কারণে। তাই ইংরেজের সহকারী হিসাবে হিন্দুরাই কলিকাতার আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধিতে ভাগ বসানোর সুযোগ পায় একচেটিয়াভাবে। পঞ্জাশষাইট বছরের মধ্যে ইংরেজ শাসনকেন্দ্র কলিকাতা হয়া উঠে নয়া গজায়া উঠা হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তের শহর, যার একদম উপরে ইংরেজ প্রভু, তার নিচে নয়াধনী ছোট একটা ব্রাক্ষন্যবাদীর দল, তার নিচে অন্যান্য মধ্যবিত্ত হিন্দু জনগোষ্ঠী। সেইখানে মুসলমানরা ছিল নয়া-গরীব জনগোষ্ঠীর অংশ, যারা আগের পেশা ও স্বচ্ছতা হারায়া বাঁচার তাগিদে সমাজের নিচু স্তরের পেশার খাতায় নাম লেখাইতে বাধ্য হইছে। তারা তখন কেবলই আমজনতার শামিল হওয়া উপাদান।

বৃটিশের মোসাহেবি মারফত তাদের লাই পায়া কলিকাতা শহরে ব্যবসা বা চাকরি নিয়া প্রচুর অর্থবিত্তের মালিক হয় সেই ব্রাক্ষন্যবাদী ছোট দলটা। একদিকে অর্থবিত্ত আরেকদিকে উপনিবেশক ইংরেজের সাথে সম্পর্কের কারনে উনিশ শতকের সূচনায় শিক্ষা-সংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এরাই সামনের সারিতে থাকার সুযোগ পায়। ইঙ্গুল-কলেজ খোলা ও পরিচালনা, ইঙ্গুলে পড়ার বইপত্র লেখা ও ছাপানো, ছাপাখানা ব্যবসা, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, নাটক-ঘর্য়েটার পরিচালনাসহ যাবতীয় সাংস্কৃতিক কামকাজে এদের আছিল একচেটিয়া মাতৃকরি।

এর বাইরে ছিলো দেশের নিরানক্ষিত শতাংশের চেয়েও বেশি মানুষ। ব্রাহ্মণবাদী সমাজ-দর্শন ও মুসলিমবিদ্বেষী অপপ্রচারণার সাথে বিশেষ কোনো যোগ আছিল না মূল হিন্দু জনগোষ্ঠীর। হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ মিলায়া যে আমজনতা তারা এতসব রদবদলে কোনো প্রভাব রাখতে পারে নাই। সিরাজউদ্দেলার পতনে বা ষড়যন্ত্রকারী তথাকথিত উঁচা জাতের ব্রাহ্মণবাদীদের রমরমা উন্নতিতে আমজনতার ভাগ্যের কোন হেরফের হয় নাই, হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ কারুরই না। কাজেই কলিকাতাকেন্দ্রিক কিছু ব্রাহ্মণবাদী লেখক-ভাবুকের আকামগুলা আলোচনার সময় এইসবের হোতাদেরকে যদি কেবল হিন্দু বইলা উল্লেখ করি তাইলে হিন্দু জনগোষ্ঠীর উপ্রে অবিচার করা হবে, সেইটা একটা আংশিক মিথ্যা বয়ানও হবে। তাই আমরা এই চিন্তাধারার অনুসারীদেরকে ব্রাহ্মণবাদী-হিন্দুত্ববাদী নামেই ডাকব। উনিশ শতকের শুরুর দিকের দলটা ছিলো ব্রাহ্মণবাদী, পরের প্রজন্মের মানুষগুলা পুরাই ব্রাহ্মণ-হিন্দুত্ববাদী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে।

দুই

ভারতে আসা ইংরেজদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতে লেখা পুরানা বইপত্র নিয়া বেশ আগ্রহ দেখা দেয় আঠারো শতকের শেষ থাইকা। এই বিষয়টাও ব্রাহ্মণবাদীদেরকে আর্যত্ববাদী ও হিন্দুত্ববাদী হয়া উঠতে বেশ উক্ফানি দিছিল। ব্যবসা ও অন্যান্য সূত্রে ইউরোপিয়দের সাথে ভারতের যোগাযোগ ঘটে যোল-সতর শতক থাইকা। যারা এইখানে আসতো তাদের অনেকে এই অঞ্চলের ভাষা সংস্কৃতি সম্পর্কেও জানার চেষ্টা করতো। এইভাবে সংস্কৃত ভাষা ও পুরানা বইপত্রের সাথে তাদের জানবুৰো হওয়ার সূত্রে ইউরোপের অনেকে এই বিষয়ে সাধারণ কিছু ধারণা লাভ করে। চিন্তাশীল কেউ কেউ বুবাতে পারে সংস্কৃত ভাষার সাথে বেশ মিল আছে ইতালিয়, ফরাশি, জর্মন প্রভৃতি ভাষার। এদের মধ্যে ইতালিয় ব্যবসায়ী-পর্যটক ফিলিপ্পো সাসেতি (১৫৪০-১৫৮৮), ইংলিশ ধর্মপ্রচারক-ভাষাতাত্ত্বিক থমাস স্টেফান (১৫৪৯-১৬১৯), সুইডিশ ভাষাতাত্ত্বিক আঁদ্রে জ্যাগার (১৬৬০-১৭৩০), ইংলিশ লেখক ন্যাথানিয়েল ব্র্যাসি হ্যালহেড (১৭৫১-১৮৩০) প্রমুখের নাম বলা যায়। জ্যাগার ১৬৮৬ সালেই জোরেসোরে বলেন যে, ফরাশি, গ্রিক, ইতালিয়, গোথিক ও অন্যান্য জর্মন ভাষা আর সংস্কৃত হয়ত অনেককাল আগে একটা ভাষা থাইকা জন্মাইছে। পলাশির যুদ্ধের মধ্য দিয়া ইংরেজ উপনিবেশ কায়েম হওন্নের পরে

ইউরোপীয় বিশেষ কইরা ইংরেজদের মধ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে জ্ঞান
আগ্রহ আরো বাড়ে ।

শিক্ষিত ইউরোপীয়দের মধ্যে যারা লেখালেখি-গবেষনার সাথে জড়িত ছিল ন
তারা আবার ভারতের চিনত অন্যভাবে । নানা জনের লেখা ভ্রমণ ডায়রী, বিদ্যুল,
অভিজ্ঞতার বয়ান শুইনা তাদের কাছে ভারত হয়া উঠে একটা রহস্যময় অব
আজগুবির দেশ । তারা মনে করত এই দেশ যাদুবিদ্যা, বিশ্বাস হয় না সব প্র্যাণ,
ভূতপ্রেত আর কুসংস্কারে ভরা । সেইখানের মানুষ অশিক্ষিত, বর্বর, কোনো দেশে
জায়গার মানুষ মানুষের গোশত্ত পর্যন্ত থায় ।

ভারত দখলের পরে ইংরেজরা যখন ভাগ্য ফিরানোর আশায় দলে দলে ভারতে
আসতেছিল তখন উচ্চশিক্ষিত ইংরেজরা জানতো ভারতের সংস্কৃত ভাষা আর
সাহিত্য বহু পুরানা জিনিষ, অনেক আর সমৃদ্ধ । অন্যদের মনের মধ্যে ছিল সেই
আজগুবির দেশ ভারত, রোমান্টিক অভিযাত্রার দেশ ভারত । এই ধরনের জ্ঞান নিয়া
ভারতে আসার পরে তাদের অনেকে চাকরির ফাঁকে ফাঁকে এই দেশ আর তার
মানুষজন ভাষা শিল্পসাহিত্য নিয়া চিন্তাভাবনা করতেন, যদি এই বিষয়ে কিছু পদ্ধতি
ফলান্ব যায় তাইলে ইউরোপে বিরাট নাম কামানো যাবে । এদের মধ্যে নাথানিয়েল
ব্র্যাস হ্যালহেড ও উইলিয়াম জোনসের কথা বলা লাগে সবার আগে ।

১৭৭১ সালে ভারতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রাইটার হিসাবে চাকরি নেন
হ্যালহেড । লক্ষনে থাকতে ভারত নিয়া বেশ পড়াশোনা করেন জোনস এবং ভারত
বিশেষজ্ঞ হিসাবে নাম কামায়া ফেলেন । ভারতে হাই কোর্টের বিচারকের চাকরি নিয়া
আসেন ১৭৮৩ সালে । কলিকাতায় আইসা জোনস শুরু করেন সংস্কৃত ভাষা ও
সাহিত্য পড়া । এই দুইজনে মিহলা বিশেষত জোনস সংস্কৃত ভাষা আর সাহিত্যের
ব্যাপক প্রশংসা কইরা লেখতে থাকেন । ১৭৮৪ সালে তিনিই সবাইরে একসাথে
ডাইকা গঠন করেন এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল, যার কাজ হইল ভারত এবং
আশপাশের অঞ্চলগুলার সকল বিষয়ে খোজখবর ও জানবুঝ করা । বাস্তবে চলতে
থাকে ভারতের ইতিহাস, সংস্কৃত ভাষা আর পুরানা বইপত্রের খোজ ।

প্রথমে হ্যালহেড পরে জোনস সংস্কৃত ভাষারে ভারতের সব ভাষার মাবাপ বইলা
রায় দেন । এই ধারায় উইলিয়াম জোনস (১৭৪৬-১৭৯৪), ন্যাথানিয়েল ব্রাদি
হ্যালহেড(১৭৫১-১৮৩০), হেনরি টমাস কোলক্রক (১৭৬৫-১৮৩৭), ফ্রেডরিশ ফন
শ্লেগেল(১৭৭২-১৮২৯), ফ্রাঞ্জ বপ (১৭৯১-১৮৭৬), ম্যাক্স মুলারসহ (১৮২০-
১৯০০) অনেক পদ্ধতি সংস্কৃত ভাষায় লেখা পুরানা বইপত্র অনুবাদ কইরা,
প্রবন্ধনিবন্ধ লেইখা সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতে লেখা হিন্দু ধর্মীয় বইপত্রকে বিশেষ
গুরুত্বের কইরা তোলেন । তারা এমন একটা ধারনারে জনপ্রিয় করেন যে, সংস্কৃত
ভাষা, হিন্দু ধর্ম ও অন্যান্য বিষয়ে লেখা পুরানা বইপত্র খুবই উন্নত এমন এক অতীত

সভ্যতার নজির, যা দুনিয়ার খুব কম দেশেই আছে। তবে হিন্দুরা সেই সভ্যতা হারায়া ফেলছে বহু আগেই। এখন তাদেরকে ইংরেজের সবক নিয়া সভ্য, মানবিক ও শিক্ষিত হইতে হবে, জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নতি করতে হবে। এইভাবে উনিশ শতকের প্রথম আধাকালের মধ্যে হিন্দু ধর্মীয় পুরান, ধর্মীয় কিস্সা কাহিনী ইত্যাদি জনমনে জায়গা নেয় উন্নত মানের সাহিত্য হিসাবে।

ইংরেজের মুখে নিজেদের ধর্মচর্চার মাধ্যম সংস্কৃত ভাষা আর ভারতের প্রাচীন সভ্যতার প্রশংসা শুইনা এইসব বিষয়ে আগ্রহ তৈয়ার হয় কলিকাতার সেই সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণবাদীদের মধ্যে। (বাংলা ভাষা সংস্কৃতের সন্তান'- হ্যালহেড-জোনসদের এই আন্দাজি বজ্বে বাংলা ভাষাকেও নিজেদের জিনিষ বইলা ভাবতে শুরু করে) আগে তারা ভাল চোখে দেখতো না বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিরে। এই কথা আমরা আন্দাজে বলতেছি না, রীতিমত লিখিত সাবুদ আছে। যেমন পাদরি জেমস লঙ্গ তার আদিপর্বে বাংলা প্রকাশনা ও সাংবাদিকতা বইয়ে 'কোয়ার্টারলি ফ্রেড অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ছাপা একটা নিবন্ধের বরাত দিয়া লেখছেন:

✓ বিশ বছর আগে একজন পত্রিত নির্ভূল বাংলা লিখলে তাকে সকলে উপহাস করত। এ অবজ্ঞা এমনই প্রবল আকার ধারণ করেছিলো যে, তারা যেমন অতিশয় নিষ্ঠার সাথে দেব-ভাষা (সংস্কৃত) চর্চা করত, তেমনি ভুল বাংলা লিখতে পারাকেও গৌরবের বিষয় বলে প্রচার করত (লঙ্গ, ১৯৯৮: ১৪২)। ✓

আগে উল্লেখ করছি কলিকাতায় আইসা এরা বেশ অর্থ-বিত্তেরও মালিক হয়া গেছিল। (ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের মাধ্যমে প্রচুর বইপত্র ছাপা হয়া তাদের হাতে পড়তেছিল যার বেশির ভাগই হিন্দু ধর্মীয় বই বা ধর্মীয় জনসাহিত্য। এর মধ্যে চলতি বাংলা ভাষার প্রচুর বাংলা আরবি ফারসি শব্দ বাদ দিয়া তার জায়গায় সংস্কৃত শব্দ বসায়া বাংলা ভাষারে সাজায়া নেয়া হইছে সংস্কৃতের নিয়মে। এইটাকেই বাংলা ভাষার সংস্কৃতকরণ বলা হয়)

ইংরেজদের সাথগুনে ডিরোজিও, হিন্দু কলেজ, ইংরেজি বাংলা পত্রিকা, সভা সমিতির ইত্যাদির প্রভাবে ফ্রান্সিস বেকন, স্টুয়ার্ট মিল, টমাস পেইন, জেরেমি বেনথাম, অগাস্ট কোঁতে, চার্লস ডারউইন প্রভৃতি ইউরোপিয় লেখকদের ভাবনার সাথে পরিচয় হয় তাদের। ব্রাহ্মণবাদীরা ইউরোপিয় প্রাচ্যবাদীদের ভাবনার দেখাদেখি প্রাচীন ভারতে একটা হিন্দু ধর্মভিত্তিক আদর্শ সমাজ আর একীভূত স্বাধীন ভারত সম্রাজ্য আছিল বইলা কল্পনা কইরা নেন। এই ভাবনা উনিশ শতকের শেষের অর্ধেকে বাংলার ইতিহাস নতুন কইরা লেখার গভীর তাড়ণার জন্ম দেয়। সেই ইতিহাস হইতে হবে এমন যেখানে থাকবে প্রাচীনকালের একীভূত আর্য-হিন্দু ভারত ও আদর্শ হিন্দু সমাজের কথা, আর থাকবে আর্য-হিন্দুর বীরত্বের কাহিনী। কিন্তু প্রচলিত ইতিহাসে তা নাই। তবে ধর্মীয় পুরান, লোককাহিনী, জনসাহিত্যে অনেক

হিন্দু রাজা সেনাপতি যোদ্ধার বীরত্বপূর্ণ গল্পকাহিনী আছে। তাই হিন্দুত্ববাদীরা ধর্মীয় পুরান, লোককাহিনী, জনসাহিত্যের গল্পগুলোকেই প্রাচীন ভারত ও বাংলার 'ইতিহাস' হিসাবে হাজির করেন।

(কলিকাতাকেন্দ্রিক নয়া ব্রাহ্মণবাদী চিন্তাধারার প্রথম প্রজন্মের মধ্যে ছিলেন রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্তসহ আরো অনেকে। এদের মধ্যে এক বিদ্যাসাগর ছাড়া সম্ভবত আর কেউ রেহাই পায় নাই ব্রাহ্মণবাদী মুসলিম-বিদ্বেষের আছর থাইকা, যদিও কারো লেখায় তা প্রকাশ্য কারো লেখায় আড়ালে হাজির আছে। তবে একীভুত আর্য-হিন্দু ভারতের কল্পনায় সবাই সমানতালে নেশাগ্রস্থ হইতে পারছিলেন।)

(উনিশ শতকের প্রথম অর্ধেকের ব্রাহ্মণবাদী মুসলিম-বিদ্বেষী চিন্তা আত্মগৌরবের অবিরাম খোঁজে শেষের অর্ধেকে আইসা হয়া যায় হিন্দুত্ববাদী পুনর্জাগরন।) এই দ্বিতীয় পর্যায়ের সংয়স্তান হইলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীনচন্দ্র সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, রঞ্জনীকান্ত চক্রবর্তি, নিখিলনাথ রায়, নগেন্দ্রনাথ বসু, এরা। এই জোশ যৌবনের রবীন্দ্রনাথের উপর খানিকটা আছর করছিল বইলাই বাংলাদেশে লুটতরাজ, গনহত্যা, হরনধর্মন অভিযানের নায়ক শিবাজীর প্রশংসা কইরা কবিতা লেখতে পারছিলেন।

তিনি

বাংলাদেশের ইতিহাস লেখার বওনি হইছে মুসলিম ইতিহাস লেখকদের হাতে। তার আগে ইতিহাস লেখার চল্ল আছিল না এই অঞ্চলে। দুই একজন রাজাবাদশাহর জীবন নিয়া কিছু কাহিনী লেখা হইছে সংস্কৃত ভাষায়, যার কোনো কোনোটা মুসলমানরা বাংলার ইতিহাস লেখা আরম্ভ করার পরে। তাই মধ্যযুগে বাংলার ইতিহাস লেখার কথা তুললে মুসলমানদের বইয়েরই নাম করতে হয়, যেইগুলা মধ্যযুগের বাংলাদেশের রাজনীতির ইতিহাসের খনি। সংস্কৃতে লেখা সাহিত্যের কিছু বই থাইকা ও ইতিহাসের তথ্য পাওয়া যায়। যেমন সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত, ভানভট্টের হর্ষচরিত। পাথর, গুহা, পুরানাকালের খাস্তা, মসজিদ মন্দিরের দেয়াল, তামার পাত ইত্যাদির মধ্যে পাওয়া খুদাইলেখার বিবরন, পুরানা সাহিত্যিক রচনা, ভিন্নদেশি বইপত্রে এই দেশ নিয়া লেখা কথাবার্তা প্রভৃতি থাইকা আরও ঐতিহাসিক তথ্য জোগাড় হয়। এগুলাই বাংলাদেশের ইতিহাসের মালমশলা।

মুসলমান ইতিহাস লেখকদের বই কাজে লাগায়া আধুনিক কালে বাংলাদেশের প্রথম ইতিহাস লেখেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সেনা কর্মকর্তা চার্লস স্টুয়ার্ট (১৭৫৮- ১৮২৮)। তার বইয়ের নাম *The History of Bengal, From the First Mohammedan Invasion until the Virtual Conquest of that Country by the English AD 1757*। প্রকাশক লন্ডনের ব্ল্যাক পেরি এন্ড কো., ছাপা হয় ১৮১৩ সালে।

জন ক্লার্ক মার্শম্যান লেখেন *Outline of The history of Bengal* (1838)। বাঙালার ইতিহাস নামে এর তরজমা করেন গোবিন্দচন্দ্র সেন। প্রকাশ করেন বজ্জনাথ বসু, চোরবাগানের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান প্রেস থাইকা, ১৮৪০ সালে। বইটার আরো বাংলা অনুবাদ বাইর হইছিল মনে হয়। কারণ মেজর টি মার্শাল নামে এক ভদ্রলোকের সম্পাদনায় *A Guide to Bengal* নামে একটা বই বাইর হয় ১৮৪৬ সালে সরকারের টাকায়, মেসার্স পি এস ডি'রোজারিও এন্ড কোং থাইকা। সেইখানে সম্পাদক সাহেব লেখছেন মার্শম্যানের মূল ইংরেজি বই থাইকা বাছাই করা জায়গাগুলার বাংলা অনুবাদ করছিলেন শ্রীঙীশুরচন্দ্র শর্মা; *A Guide to Bengal* হইল শ্রীঙীশুরচন্দ্র শর্মার করা বাংলা তরজমার ইংরেজি তরজমা। শ্রীঙীশুরচন্দ্র শর্মা হইলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তাইলে বুঝা যায় ১৮৪৬ সালের আগেই বাইর হইছিলো ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বাংলা অনুবাদটা।

সম্ভবত স্টুয়ার্টের বইটাই আধুনিককালে লেখা বাংলাদেশের প্রথম ইতিহাস। যাইহোক, স্টুয়ার্ট বা মার্শম্যান কিংবা এইসময় আরো যারা বাংলাদেশের পূরা ইতিহাস বা বাছাই করা সময়ের ইতিহাস লেখছেন তারা সকলেই মুসলিম ইতিহাসবিদদের লেখা বইপত্র থাইকা বিবরন নিছেন। এইটা ছিলো সেই সময়ের চল। স্টুয়ার্ট নিজেই স্বীকার করছেন: *The Greater part of this work is composed of translation made by myself from Persian historians...* (স্টুয়ার্ট ১৮১৩ : ii)। (এই বইয়ের বেশিরভাগটাই হইতেছে ফারসি ঐতিহাসিকদের লেখার আমার করা অনুবাদ . . .)

উনিশ শতকের প্রথম অর্ধেক পর্যন্ত এইরকম চলতেছিল। মুসলমান ইতিহাস লেখকদের লেখা বিবরন আর নতুন পাওয়া তথ্য নিয়া কেউ ইংরেজিতে ইতিহাস সাজাইতেছিলেন, কেউ বা বাংলায় দুইএকটা নিবন্ধ লেখতেছিলেন। মোট কথা এইসব ইতিহাসকে বাংলার ইতিহাস হিসাবেই নেয়া হইছিল। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধেক পর্যন্ত এর বিপক্ষে বিশেষ কোনো কথা শোনা যায় নাই, কেবল ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মার্শম্যান অনুবাদের বিজ্ঞাপনে একটা মন্তব্য ছাড়া। ঈশ্বরচন্দ্র তার অনুবাদে বিজ্ঞাপন নামের অংশে লেখছেন, “এই পুষ্টকে অতি দূরাচার নবাব সিরাজউদ্দৌলার সিংহাসনারোহন অবধি চিরস্মরনীয় লর্ড উইলয়াম বেন্টিক্স মহোদয়ের

অধিকার সমাপ্তি পর্যন্ত বর্ণিত আছে।” (বিদ্যাসাগর, ১৯৩৫: বিজ্ঞাপন অংশ) এই দুই লাইনেই বুঝা যাইতেছে সিরাজউদ্দৌলার প্রতি ইতিহাস লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মনের ভাব কি রকম আছিল। সিরাজের বিরুদ্ধে ইংরেজ এবং ব্রাহ্মন্যবাদীদের সংগঠিত অপপ্রচাররে তিনি ইতিহাস বইলা বিশ্বাস করতেন মনে হয়।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরনের সন্তান বক্ষিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়রা যখন নয়া হিন্দুত্ববাদী জোশে চাঙ্গা, খাঁটি আর্যত্বের গৌরবে দেমাগী তখন ইতিহাসের সন্ধান করতে গিয়া পাইলেন বহিরাগত মধ্যএশীয় ও তুর্কি শক্তির কাছে বাংলার আরেক বহিরাগত সেন রাজাদের পরাজয়ের বিবরন। তারা এইসব পরাজিত রাজারাজড়াদেরকে কেবল রাজা না, হিন্দু রাজা হিসাবে দেখলেন। সেনেরা যেহেতু হিন্দু ধর্মাবলম্বী ছিলেন তাই তাদেরকে বক্ষিমের বিবেচনায় আর বহিরাগত বইলা মনে হয় নাই। কারন বক্ষিম তখন মানসিকভাবে হিন্দুত্ববাদ নামের যে ধর্মরাজ্যের মানুষ, সেন রাজশক্তিকেও তিনি সেই রাজ্যের মানুষ ভাবেন, দুই পক্ষই একই হিন্দুত্ববাদ নামক মনোরাজ্যের বাসিন্দা। তাই সেনদের পরাজয় বক্ষিমদের কাছে দেখা দেয় মুসলমানের কাছে হিন্দু জাতির পরাজয় হিসাবে। এই জাতীয় ভাবনা ছিলো বাংলায় সাম্প্রদায়িক ইতিহাসচর্চা নামের ক্ষয়রোগের সূচনা।

বক্ষিমচন্দ্রের দেখলেন তাদের হিন্দুত্ববাদী নবজাগরনের গৌরবের পথে কাঁটা হয় দাঁড়ায়া আছে প্রচলিত ইতিহাস, যেখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বী শাসকদের পরাজয় আর মুসলিমদের ধারাবাহিক বিজয়ের কথাই লেখা। তাই তারা বাংলা তথা ভারতের এমন এক ইতিহাসের কল্পনা করতে আরম্ভ করলেন যেখানে আদিকাল থাইকা একীভূত ভারতের কথা থাকবে, সেখানে এক আদর্শ আর্য-হিন্দু সমাজের বয়ান থাকবে, হিন্দুর বাহ্যবল আর জয়গৌরবের কথা থাকবে, এবং লেখা থাকবে মুসলমানের চরিত্রানুসন্ধান আর হীনতার কথা। এই মনোভাব থাইকা জন্ম হয় বক্ষিম গয়রহের ইতিহাস লেখার তাগিদ। বক্ষিম লেখেন “বাঙ্গালার ইতিহাস নাই, যাহা আছে, তাহা ইতিহাস নয়, তাহা কতক উপন্যাস, কতক বাঙ্গালীর বিদেশী বিধর্মীঅসার পরপীড়কদিগের জীবনচরিতমাত্র. . .। (বক্ষিমচন্দ্র, ১৯৯১: ৩৩৭) বাংলা ভাষা কেমন হবে সেই বিতর্কে উনিশ শতকের প্রথম দিকে একবার মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে গালামন্দ চলছিল। আরেকবার শতকের শেষ দিকে বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা মাধ্যমে মুসলমান শাসকদেরকে ধর্মের পরিচয়ে বিচার করা, তাদেরকে নির্যাতক, নির্মম হিসাবে প্রচার করা এবং মুসলমানদের লিখিত ইতিহাসকে মিথ্যা গালগন্ন হিসাবে উড়ায়া দেয়ার চেষ্টা শুরু হয়। বক্ষিমচন্দ্র এই চেষ্টার সর্দার। পূর্বোক্ত প্রবক্ষে বক্ষিম লেখেন:

বাঙালী আজকাল বড় হইতে চায়। হায়! বাঙালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই? বাঙালার ইতিহাস চাই। নহিলে বাঙালী কখনও মানুষ হইবে না। . . সাহেবেরা বাঙালার ইতিহাস সম্পর্কে ভূরি ভূরি গ্রন্থ লিখিয়াছেন। স্টুয়ার্ট সাহেবের বই, এত বড় ভারী বই যে, ছুঁড়িয়া মারিলে জোয়ান মানুষ খুন হয়, আর মার্শমান্ লেখাবিজ্ঞ প্রভৃতি ছুট কিতালে বাঙালার ইতিহাস লিখিয়া, অনেক টাকা রোজগার করিয়াছেন।

কিন্তু এ সকলে বাঙালার ঐতিহাসিক কোন কথা আছে কি? আমাদিগের বিবেচনায় একখানি ইংরেজি গ্রন্থেও বাঙালার প্রকৃত ইতিহাস নাই। সে সকলে যদি কিছু থাকে, তবে যে সকল মুসলমান বাঙালার বাদসাহ, বাঙালার সুবাদার ইত্যাদি নির্বর্থক উপাধিধারন করিয়া, নিরুদ্ধে শয্যায় শয়ন করিয়া থাকিত, তাহাদিগের জন্ম মৃত্যু গৃহবিবাদ এবং খিচুড়ীভোজন মাত্র। ইহা বাঙালার ইতিহাস নয়, ইহা বাঙালার ইতিহাসের এক অংশও নয়। বাঙালার ইতিহাসের সঙ্গে ইহার কোন সম্পর্কও নাই। বাঙালী জাতির ইতিহাস ইহাতে কিছুই নাই। যে বাঙালী এ সকলকে বাঙালার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙালী নয়। আজাতিগৌরবাঙ্গ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদেবী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে, সে বাঙালী নয় (বঙ্গিমচন্দ্র, ১৯৯১: ৩৩৬)।

বঙ্গিমচন্দ্রের লেখার বড় একটা জায়গা তুইলা দিলাম, তার মনের রোখটা ধরতে। ইতিহাসের সন্ধানে কোন জায়গা যাইতে হবে সেই বিষয়ে তাঁর পরামর্শ কি সেইটা বুঝার জন্য তার আরো কিছু কথা এইখানে নিয়া আসা দরকার। একই প্রবন্ধে তিনি লেখেন:

আইস, আমরা সকলে মিলিয়া বাঙালার ইতিহাসের অনুসন্ধান করি। যাহার যত দূর সাধ্য, সে তত দূর করুক, ক্ষুদ্র কীট যোজনব্যাপী দীপ নির্মাণ করে। একের কাজ নয়, সকলে মিলিয়া করিতে হইবে। অনেকে না বুঝিলে না বুঝিতে পারেন যে, কোথায় কোন পথে অনুসন্ধান করিতে হইবে। অতএব আমরা তাহার দুই একটা উদাহরণ দিতেছি।

বাঙালীজাতি কোথা হইতে উৎপন্ন হইল? অনেকে মুখে বলেন, বাঙালীরা আর্যজাতি। কিন্তু সকল বাঙালীই কি আর্য? ব্রাহ্মণাদি আর্যজাতি বটে, কিন্তু হাড়ি, ডোম, মুচি কাওরা, ইহারাও কি আর্যজাতি? যদি না হয়, তবে ইহারা কোথা হইতে আসিল? ইঁহারা কোন অনার্যজাতির বংশ, ইহাদিগের পূর্বপুরুষেরা কবে বাঙালায় আসিল? . . . কোন গ্রন্থে কোন সময়ে আর্যদিগের প্রাথমিক উল্লেখ আছে? পুরাণ, ইতিহাস খুঁজিয়া বঙ্গ, মৎস্য, তাম্রলিপি প্রভৃতি প্রদেশের অনেক উল্লেখ পাইবে। কিন্তু কোথাও এমন পাইবে না যে, আদিশূরের পূর্বে বাঙালায় বিশিষ্ট পরিমাণে আর্যাধিকার হইয়াছিল। কেবল কোথাও আর্যবংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা, কোথাও আর্যবংশীয় ব্রাহ্মণ তাহার পুরোহিত। . . .

হিন্দুর বীরত্বের ইতিহাস নাই বইলা যার আফসোসের সীমা ছিল না সেই বক্ষিমচন্দ্র একটি বইয়ের খুব প্রশংসন্ত করছেন। সেইটা শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙালার ইতিহাস, প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ সালে। বইটা এতটাই জনপ্রিয় হয় যে পাঁচ বছরের মধ্যে ১৪ বার ছাপা হয়। বক্ষিমচন্দ্রের যে কয়টা প্রবন্ধাতার কথা উপ্রে উল্লেখ করছি তার সব কয়টা রাজকৃষ্ণের ইতিহাসে আছে। প্রথমে তিনি নির্দিষ্ট তথ্য প্রমান ছাড়াই সংখ্যালঘু তথাকথিত উঁচা জাতের হিন্দুদেরকে আর্য বইলা রায় দিয়া লেখেন:

ইহা এক প্রকার অবধারিত হইয়াছে যে অতি পূর্বকালে সাঁওতাল পাহাড়িয়া প্রভৃতি জাতিই এ দেশে বাস করিত। পরে ‘আর্য’ নামধারী হিন্দুরা তাহাদিগকে পরাজিত করিয়া এ দেশ দখল করেন। পরাজিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কেহ কেহ জঙ্গলে পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল, কেহ কেহ বিজেতাদিগের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিল। এতদেশীয় বর্তমান অসভ্য জাতিগণ এবং নিম্নশ্রেণির হিন্দুগণ তাহাদিগেরই সন্তান সন্তুতি (রাজকৃষ্ণ, ১৮৭৯ : ৬)।

তার কথা খেয়াল করেন: স্থানীয়দের একটা অংশ ‘আর্য’দের দাস হয়, অন্যরা কেউ কেউ বর্তমানের অসভ্য জাতি আর বাকিরা নিচা জাতের হিন্দু। অর্থাৎ স্থানীয়রা হয় ‘দাস’ না হয় ‘অসভ্য’ নাইলে নিচা জাতের হিন্দু, কেউ-ই উঁচা জাতের মানুষ না। যেন আদি বাঙালি হওয়া এমন এক দোষ যে দোষে কখনো উঁচা জাতে উঠতে পারবে না তারা। এরচেয়ে জঘন্য বর্নবাদী মন্তব্য আর কি হইতে পারে! এরপর তিনি মহাভারতের মত পুরান কাহিনীগুলারে ইতিহাসের উৎস হিসাবে ব্যবহার করেন। বাংলার মুসলমানরা নিচু জাতের হিন্দু থাইকা জাত দিয়া মুসলমান হইছে- এই কথাটা সম্ভবত শ্রীরাজকৃষ্ণের বইয়েই প্রথমবারের মত ইতিহাসের সত্য হিসাবে হাজির করা হয়। তিনি লেখেছেন :

এক্ষণে আদমশুমারিতে দেখা যাইতেছে যে সুবা বাঙালার (বিহার উড়িষ্যা বাড়বন্দসহ) প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক মুসলমান। মুসলমান-ধর্ম কিরণপে এত বহুব্যাপী হইয়াছে, জানা যায় না। মুসলমান জমিদার ও জায়গিরদারদিগের প্রভাবে যে তাহাদিগের ধর্মের অনেকদূর বিষ্টার ঘটিয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু গৌড় মুরশিদাবাদ প্রভৃতি মুসলমান রাজধানী সন্নিহিত প্রদেশ অপেক্ষা রাজশাহী, বগুড়া, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে অধিবাসীদিগের মধ্যে অধিকসংখ্যক মুসলমান, ইহা বুঝা যাইতেছে যে বাহ্বল অপেক্ষা অন্য কারনে মুসলমান ধর্মের সহায়তা করিয়াছে। (রাজকৃষ্ণ, ১৮৭৯ : ৭৪)।

এই লেখাটা পড়লে মনে হয় লেখক প্রথমেই যে কথাটা তুলতে চাইছেন সেইটা হইল, ‘এই দেশে এত মুসলমান কেন?’। এইজন্য আবার যোগ করছেন ‘এক্ষণে আদমশুমারিতে দেখা যাইতেছে যে . . .’। এই বাক্যের মধ্যে যে কথাটা না-কওয়া অবস্থায় থাইকা গেছে সেইটা এই: ‘আমরা তো সব সময় জাইনা আসছি এইদেশে

হিন্দু বেশি, মুসলমান কম। এখন উল্টা কেন?’। যাইহোক, এরপর রাজকৃষ্ণ মুসলমান মানুষ বেশি হওয়ার কারণ উল্লেখ করতে গিয়া বেভারলির কথাটাই বললেন, বক্ষিম বাবুর পরামর্শে কি না তা অবশ্য বলা যাইতেছে না:

এই সমুদায় দেখিয়া শুনিয়া অনেকে অনুমান করেন যে অনার্য্য জাতিগণ পশ্চিম হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ববাঙালায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল; এবং তান্নিমিত তৎপ্রদেশস্থ অধিবাসীরা বহুলপরিমাণে অনার্য্যবংশসম্মত বলিয়া হিন্দু সমাজে অতি নীচ শ্রেণীতে স্থান পাইয়াছিল। এরূপ হীনাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মুসলমানদিগের সময়ে দেশের রাজার সহিত সমধর্ম্ম হইতে তাহারা উৎসাহসহকারে ইচ্ছাপূর্বক যাইবে, ইহা আশ্চর্য নহে। (রাজকৃষ্ণ, ১৮৭৯ : ৭৪)।

অনার্য্য জাতির মানুষেরা পশ্চিম থাইকা পুবে আসছিল এই কথা কার কার অনুমান, অনুমানের যুক্তি কি সেইটা উল্লেখ করেন নাই। পশ্চিম মানে ভারতের উত্তর দিক। প্রচলিত ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতির সাক্ষ্য বলতেছে আগত ইন্দো-ইরানীয়দের সাথে মারামারি করতে করতে উত্তরের স্থানীয় লোকেরা আন্তে আন্তে দক্ষিণে সরছে। এখন দ্রাবিড়ভাষী দক্ষিণের বাসিন্দারাই ছিল উত্তরে। বহিরাগত ইন্দো-ইরানীয়রা যে সবসময় জিতছে এমন না, আর স্থানীয়দের সবাই যে পালায় গেছে তাও না। দুই জাতের কিছুটা মিহশা গেছে কিছুটা বিচ্ছিন্ন হয়া থাকছে। যারা বিচ্ছিন্ন হয়া থাকার সিদ্ধান্ত নিছে তারাই দক্ষিণে গেছে। মোট কথা উত্তরভারতের স্থানীয় বাসিন্দারা গেছে দক্ষিণে।

এইখানে রাজকৃষ্ণ বাবু উল্টা কথা হাজির করছেন, বলছেন তারা বাংলায় আসছে। বাংলায় আসার যুক্তি নাই। কারন বাংলা দূরের দেশ, অজানা। দক্ষিণ তাদের কাছের জায়গা, অধিবাসীরাও ছিল নানাভাবে সম্পর্কিত। আসলে বাংলার মুসলমানরা আগে নিজু জাতের হিন্দু আছিল, এই কথাটা বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যই শ্রীরাজকৃষ্ণ এমন একটা উজ্জ্বল কথা হাজির করছেন।

হিন্দুর বীরত্বের কথা বলার জন্য তিনি আবার পালি ভাষায় লেখা শ্রীলঙ্কার পুরান কাহিনীরে ইতিহাস হিসাবে উল্লেখ করছেন। শ্রীলঙ্কার পুরান মহাবংশে উল্লেখ আছে বঙ্গ ও কলিঙ্গের মাঝামাঝি এক অঞ্চলের রাজকুমারীকে এক সিংহ জোর কইরা নিয়া গিয়া বিয়া করে। সিংহের দুইটা ছেলেমেয়ে হয়। ছেলে সিংহবাহু একদিন বাপ সিংহকে খুন কইরা নিজ রাজত্বে ফিরিয়া আসে। সিংহবাহুর ছেলে রাজপুত্র বিজয় নির্বাসিত হয়া শ্রীলঙ্কায় গিয়া রাজা হয়, তার বংশধররাই পরে শ্রীলঙ্কা শাসন করে। মহাবংশে মহাকাব্যের আকারে লেখা শ্রীলংকার ইতিহাস বর্ণিত হইছে দিনলিপির মত কইরা, সেই গৌতমবুদ্ধের আমলের বিবরণও আছে। অথচ বইটার প্রথম অংশ লেখা ষষ্ঠ শতকে, যার বেশিরভাগটাই রূপকথা। দ্বিতীয় অংশ তের শতকে, সবশেষেরটা আরো পরে। একটা সিংহ মানুষের মেয়েরে জোর কইরা তুইলা নিয়া গিয়া বিয়ে করা

এবং পুত্র-কন্যা জন্ম দেয়ার কিস্সটারে রাজকৃষ্ণ কোন বুদ্ধিতে ইতিহাস হিসাবে চালাইতে গেলেন তা আমাদের চিন্তায় ধরে না। রূপকথাটারেই শ্রীলঙ্কায় বাঙালির উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ইতিহাস হিসাবে বিশ্বাস করাইতে চাইছেন রাজকৃষ্ণ। সবশেষে তিনি সিরাজউদ্দৌলারে চরিত্রহীন বলে রায় দেন: “সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে আরোহন করিয়া দুর্চরিতা ও নিষ্ঠুরতা নিবন্ধন শীঘ্রই লোকের অগ্রিয় হইয়া উঠিলেন” (রাজকৃষ্ণ, ১৮৭৯ : ৬)।

রাজকৃষ্ণ কোনো তথ্যপ্রমান ছাড়াই বলছেন অতি প্রাচীনকালে ‘আর্য নামধারী’ হিন্দুরা বাঙালির পূর্বপুরুষদেরকে পরাজিত কইরা এই দেশ দখল করে এবং এইখানে বসতি করে। খৃস্টের জন্মের আগে থাইক শুরু কইরা পরের এক-দুইশ বছর পর্যন্ত মেগাস্থিনিস, পুটার্ক, টলেমিসহ অনেক গ্রীক লেখক-ভূগোলবিদ বঙ্গের বিবরণ দিয়া গেছেন। সেইগুলো পড়লে বুঝা যায় এই অঞ্চলটা আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিকভাবে ভারতের অন্য অংশ থাইকা আলাদা। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে টলেমি লেখছেন গঙ্গারিডি পরাক্রান্ত এক আলাদা রাজ্য। তার রাজধানীর নাম গঙ্গে। মূলত গুপ্ত সম্রাজ্যের সময় কিছু সরকারি লোকজন ও ব্রাহ্মণ এইদেশে আসার উল্লেখ পাওয়া গেছে। তার আগে বাংলাদেশে আর্য বসতের প্রমান নাই।

রাজকৃষ্ণ পুরাকালের বাংলাদেশে হিন্দুর আধিপত্য প্রমানের জন্য পুরানরে ইতিহাস বানাইছেন। অথচ এইসব পুরান লেখা হইছে মাত্র সাতআটশ বছর আগে। সবশেষে যেটা বলছেন নবাব সিরাজ উদ্দৌলা সম্পর্কে সেইটা সিরাজের চরিত্র হননের জন্য ইংরেজদের অপপ্রচারনার অংশ, সেই কথা অনেকে প্রমানসহ বলছেন। এইখানে আবার আলাদা আলোচনার দরকার আছে মনে হয় না।

রাজকৃষ্ণের বইটা প্রকাশ পায় ১৮৭৪ সালে। ১৮৭২ সাল থাইকা বঙ্গদর্শন পত্রিকা বাইর হইতেছিলো বঙ্গিমচন্দ্রের সম্পাদনায়। বাঙালির ইতিহাসের অভাব, বীরতত্ত্বাধীন ঘাটতি নিয়া বঙ্গিমবাবু অনেক আফসোস করছেন বিভিন্ন প্রবন্ধে। এইসব লেখার কোন কোনটা ১৮৭৪ সালের আগেই বাইর হয়া থাকতে পারে। এই বিষয়ে নিশ্চিত তথ্য না থাকায় আমরা বুঝতে পারতেছি না রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়কে বঙ্গিমচন্দ্র প্রভাবিত করছিলেন কি না। তবে রাজকৃষ্ণের বাঙালার ইতিহাস বইটা খুব পছন্দ হয় বঙ্গিমচন্দ্র, যদিও বইটা কেন ছোট হইল, বড় কইরা পুরা ইতিহাস কেন লেখা হইল না, এই জাতীয় সমালোচনা তিনি করছেন। তবে সব মিলায়া তার কথা হইল: দ্বিদশ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বাঙালার ইতিহাস বোধহয় আর নাই। অন্নের মধ্যে ইহাতে যত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় তত বাঙালা ভাষায় দুর্লভ। সেই সকল কথার মধ্যে অনেকগুলি নতুন; এবং অবশ্য জ্ঞাতব্য (বঙ্গিমচন্দ্র, ১৯৯১: ৩৩৭-৩৮)।

এইটাই মূল কথা, রাজকৃষ্ণের বইয়ে হিন্দুর বাঙ্গবলের প্রমান হিসাবে পুরানরে নিয়া আসা হইছে, সিরাজের চরিত্র হনন করা হইছে এবং আর্য জাতির বেডাগিরির

কথা বলা হইছে এবং বাংলার আদিবাসি অর্থাৎ আদত বাঙালিদেরকে ছোটলোক বইলা গাইল দেয়া হইছে; এবং বক্ষিমের মতে যেটা সবচেয়ে জরুরি অর্থাৎ বাংলার সব মুসলমান নিচু জাতের হিন্দু থাইকা মুসলমান হইছে, সেই কথাটাও বলা হইছে। এইজন্যই বইটার প্রশংসা করছেন বক্ষিমচন্দ্র। তার কাছে মনে হইছে ‘ঈদৃশ সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ বাঙালার ইতিহাস’ আর নাই।

সম্ভবত রাজকৃষ্ণের এই বইয়ের দ্বারা বক্ষিম নিজেও বেশ প্রভাবিত হইছিলেন। কারন, দেখা যায় রাজকৃষ্ণের বইটা বাইর হওনের পর বঙ্গদর্শনে এর যে আলোচনা করেন বক্ষিমচন্দ্র সেইখানে এইসব কথা তুলেন তিনি। এর পর থাইকা এই বিষয়ে যত প্রবন্ধ লেখছেন, যেমন ‘বাঙালার ইতিহাস সমক্ষে কয়েকটি কথা’, ‘বাঙালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ’, ‘বাঙালীর উৎপত্তি’ এইগুলাতে এইসব কথাই আরো জোরেসোরে বলছেন। তবে বখতিয়ার খিলজির বাঙলা বিজয়ের বিবরনরে বক্ষিম মিছা কথা বইলা উড়ায়া দিলেও রাজকৃষ্ণ তা করেন নাই। মনে হয় তার কান্ডজ্ঞান একটু বেশি আছিল।

হিন্দু জাতীয়তাবাদী পুনর্জাগরণের প্রভাবে হিন্দুত্ববাদী গৌরব তুলে ধরার জন্য সেইমত আনুমানিক ইতিহাস লেখার যে অভ্যাসের কথা আমরা উল্লেখ করলাম রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বাঙালার ইতিহাস তার সূচনা। সময় যত আগাইছে এই তত তাড়না বাড়ছে। কুড়ি শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত কেবল বাড়ছেই।

মৃত্যুঙ্গয়, বক্ষিমচন্দ্রের উক্ফানিতে সবচেয়ে বেশি ফলন দেখি উনিশ শতকের একেবারে শেষাশেষি আর কুড়ি শতকের প্রথমদিকের কয়টা বছরে। এই সময় বাইর হয় নিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী (১৮৯৭), নগেন্দ্রনাথ বসুর বক্ষের জাতীয় ইতিহাস (প্রথমভাগ ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথম অংশ, ১৩০৫; রাজন্যকাণ্ড কায়স্ত্রকাণ্ডের প্রথমাংশ, ১৩২১; দক্ষিণরাজ্যীয় কায়স্ত্রকাণ্ড প্রথমখণ্ড, ১৩৪০), শ্রীদুর্গাচন্দ্র স্যান্যালের বাঙালার সামাজিক ইতিহাস (১৯০৮), রঞ্জনীকান্ত চক্ৰবৰ্ত্তির গৌড়ের ইতিহাস (১৯১০), শ্রীরামপ্রসাদ চন্দের গৌড়রাজমালা (১৯১২), অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের গৌড় লেখমালা (১৯১২), রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঙালার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড- ১৯১৪, দ্বিতীয় খণ্ড ১৯১৭)। এরমধ্যে রমাপ্রসাদ চন্দের গৌড়রাজমালা বাংলা ভাষায় বহুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ ইতিহাস চৰ্চার বিষয়কর নমুনা। ইতিহাস লেখার জন্য তার পুরান, ধর্মীয় লোককাহিনী, ধর্মীয় কিংবদন্তী, পক্ষপাত আন্দাজ, উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা কোনটারই দরকার পড়ে নাই। দুর্ভাগ্যের বিষয় বাঙালি ইতিহাস লেখকরা রমাপ্রসাদের নিরপেক্ষ পক্ষতি নেয় নাই, নিছে হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস প্রকল্পেরটা।

শ্রীনিখিলনাথ রায়ের মুর্শিদাবাদ কাহিনী বেশ আলোচিত আরেকটা বই। অনেকে এই বইয়ের সাক্ষী-সাবুদ হাজির করেন। নিখিলনাথ অবশ্য তার মুসলিমবিদ্বেষ লুকানির চেষ্টা করেন নাই। বইয়ের ডেতরের তিন নম্বর পাতায়

শিরোনামের পরে এই দুই লাইন কবিতা তুইলা দেয়ার মধ্য দিয়া তার মুসলিম-বিদ্বেষ প্রকাশে সৎসাহস দেখাইছেন। লাইন দুইটা এই:

“দিল্লী মুর্শিদাবাদ হইবে এখন
মুসল্লান গৌরবের সমাধি-ভবন।”

এই দুইটা লাইন তুইলা দেওয়ায় পড়ুয়ারা সহজেই বুঝতে পারবেন লেখক নিখিলনাথ রায় ব্রিটিশের কাছে মুসলমানের পরাজয়ে খুব খুশি। দিল্লী মুর্শিদাবাদ মুসলমান গৌরবের সমাধিভবন হইলে তার আত্মত্পূর্ণ যেন বিজয়ী মানুষের মতই। যেন ব্রিটিশদের সাথে সাথে তিনিও মুসলমানদের যুক্তে হারায়া দেশ দখল করতে পারছেন। এইখানেই শেষ না, হয়ত কেবল উদ্ধৃতি দিয়া তৃপ্তি না হওয়ায় বইয়ের ভূমিকায় তার কথাটা খুইলা বলেন:

মুর্শিদাবাদ বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যার শেষ মুসল্লান রাজধানী^১ অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালার সমস্ত রাজনৈতিক ব্যাপারের সহিতই মুর্শিদাবাদের সমন্ব। এইখান হইতেই বাঙ্গালার মুসলমান রাজত্বের অবসান ও ব্রিটিশ রাজত্বের প্রতিষ্ঠা হয়। এই জন্য মুর্শিদাবাদের ইতিহাসালোচনা অত্যন্ত প্রীতিপদ বলিয়া বোধ হয় (নিখিলনাথ, ১৩১৬: ভূমিকা)।

একেবারে খোলাখুলি কথা, কোন লুকাচাপা নাই। মুর্শিদাবাদে মুসলমানের পতন হইছে আর ব্রিটিশরা ক্ষমতায় গেছে এইজন্য মুর্শিদাবাদের ইতিস লেখতে তার খুব ভাল লাগে। ইতিহাস চর্চায় সাম্প্রদায়িক মনোভাবের এমন খোলামেলা প্রকাশ খুব বেশি নাই বোধহয়।

মুর্শিদাবাদ কাহিনী বাংলাদেশের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস না। সুবে বাংলার রাজধানী থাকার সময় মুর্শিদাবাদের যেসব মানুষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ আছিলেন তাদের সম্পর্কে লেখা। মুর্শিদ কুলি খাঁনের সময় থাইকা সিরাজউদ্দৌলা পর্যন্ত আলোচনা। তাই এইখানে আর্যত্ব বা হিন্দুত্ব এবং হিন্দু জাতির বীরত্বের গপ্পো তোলার সুযোগ নাই। তারপরেও নিখিলবাবু যতটা পারছেন ততটা করতে ভুলেন নাই। যেমন, বাংলার ইতিহাসে জগৎশেষ পরিবার বিশ্বাসঘাতক দেশোদ্বোধী ঘূণিত নাম হয়া থাকলেও নিখিলনাথের মতে তারা গোটা ভারতের ক্ষমতাবান, অভিজাত ভদ্র পরিবার:

মুর্শিদাবাদের নবাবগণ সর্বদাই তাহাদের মুখাপেক্ষা করিতেন, এবং তাহাদের বলে বলী হইয়াই সমস্ত জগতে মুর্শিদাবাদের গৌরবঘোষণা করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। কি বাণিজ্য, কি রাজস্ব, সমস্ত বিষয়েই সেই ধনকুবেরগণের সাহায্য ব্যতিত কদাচ সম্পন্ন হইত। অষ্টাদশ শতকের যাবতীয় রাজনৈতিক কার্য তাহাদের পরামর্শের উপর নির্ভর করিত। তাহাদের কথায় নবাবের নবাবী রহিয়াছে, আবার তাহাদের ইঙ্গিতে নবাবের নবাবী গিয়াছে। তাহাদের কটাক্ষমাত্রেই বাঙ্গালার

তৎকালীন রাষ্ট্রবিপ্লবসমূহ সংঘটিত হইয়াছে। যে ভয়াবহ বিপ্লবে মুসলমান রাজত্বের অবসান ও বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, যাহার দিগ্দাহকারী অগ্নিকাণ্ডে হত্যভাগ্য সিরাজ পতঙ্গবৎ ভস্মীভূত হইয়া যান এবং মীরজাফর ও মীরকাসেম বিশেষরপে দণ্ড হইয়া কেহ বা অনন্তধামে কেহ বা ফকিরিপথ আশ্রয় করিয়া করিয়া শান্তি লাভ করিতে সমর্থ হন, তাহারই মূলে জগৎশেষদিগের অমোघ শক্তি নিহিত ছিল। অর্থ ও প্রাণ দিয়া তাহারা ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া গিয়াছেন (নিখিলনাথ, ১৩১৬ : ৪৯)।

গোটা উদ্ধৃতিটা পড়লে পড়ুয়াদের মনে দুইটা বুঝ জাগে। একটা হইল পলাশীর যুদ্ধে জগৎশেষ পরিবারের জঘন্য ষড়যন্ত্রের বিষয়টারে নিখিলবাবু একটা ভালো কাজ হিসাবে দেখছেন। দুই, জগৎশেষ পরিবারের ক্ষমতারে তিনি এমন একটা উঁচা জায়গায় নিয়া গেছেন যা আর মানুষের ক্ষমতার স্তরে আছে বইলা মনে হয় না, ঈশ্বরের ক্ষমতার মত মনে হয়। কারন জগতশেষেরা কটাক্ষ করলেই নবাবরা নাই হয়া যাইতেছে, সেই কটাক্ষ আবার নিখিলবাবুর বিচারে ভালো কাজ বিবেচিত হইতেছে। কেবল ঈশ্বরেরই এমন ক্ষমতা থাকে এবং ঈশ্বরের কাজেরই ভালোমদ্দ বিচার করা যায় না। তো, নিখিলবাবু জগৎশেষের পরিবারের ক্ষমতারে ঈশ্বরের ক্ষমতা বানায়া দিছেন, যার এক কটাক্ষে সিরাজ-মীরজাফর-মীরকাসিম নাই। এইখানেই নিখিলবাবুর তত্ত্ব- হিন্দু জগৎশেষের কটাক্ষে মুসলমান রাজত্ব শেষ, বৃটিশ রাজত্ব কায়েম।

মুসলমান ঐতিহাসিক চরিত্রগুলার নামে বদনাম ছড়ানোর কাজটাও তিনি করছেন, খুব বাজে ভাবে। মুর্শিদ কুলি খাঁর কাটরার মসজিদ নাকি সব মন্দির আর হিন্দুদের বাড়িগুলি ভাইঙ্গা সেই ভাঙ্গা সরঞ্জাম দিয়া বানানো হইছিলো। তিনি লেখছেন যে, মোরাদ ফরাস নামক এক ব্যক্তিরে মসজিদ বানানোর দায়িত্ব দেয়ার পর:

মোরাদ নিকটবর্তী হিন্দু মন্দির সকল ভূমিসাঁও করিয়া তাহার উপকরণ দ্বারা উক্ত কার্য্য আরম্ভ করে। জমীদার ও অন্যান্য হিন্দুগণ যে কোন পরিমাণ অর্থ প্রদান করিয়া আপনাদিগের মন্দির রক্ষা করিতে পারিতেন, কিন্তু কোনপ্রকার অনুনয় বা উৎকোচ কার্য্যকর হয় নাই। মুর্শিদাবাদ হইতে তিন চারি দিনের পথে কোথাও একটি মাত্র মন্দির অবস্থিতি করিতে পারে নাই। . . . হিন্দুদিগের ভৃত্যবর্গকে সমাধিনির্মান কাজে নিযুক্ত করা হইত। যাহাদিগের প্রভুরা অর্থ প্রদান করিতেন তাহারা নিঃস্তি পাইত। সকলকে মোরাদ ফরাসের আজ্ঞা প্রতিপালন করিতে হইত (নিখিলনাথ, ১৩১৬ : ৩২)।

কাটরা মসজিদ বানানোর সময় মন্দির ভাঙ্গার কথা কেবল মুঠী সলিমউল্লাহর তারিখ-ই-বাঙ্গালা বইয়ে উল্লেখ করা হইছে। রিয়াউজ উস সলাতীন বা সমকালীন অন্য কোন বিবরনে পাওয়া যায় না। তাছাড়া, মোরাদ ফরাস যদি মুর্শিদাবাদ থাইকা

তিন চারদিনের পথ পর্যন্ত সব মন্দির ভাইসাই থাকতো তাইলে মুর্শিদাবাদের বিরাট কীরিটেশ্বরীর মন্দির কিভাবে এখনো টিকা আছে অনেকে সেই প্রশ্নও তুলছেন। সবচেয়ে বড় কথা, বিশাল বাংলা সুবাব নবাব ও কঠোর ধর্মপ্রাণ মুর্শিদ কুলি খানের সমাধি বানাইবেন মন্দিরভাঙ্গা জিনিস দিয়া এইটা কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। এইসব কারণে বেভারিজ, খন্দকার ফজলে রাবিসহ অনেকে মন্দির ভাঙ্গার কথাটারে পুরাই বানোয়াট বইলা খারিজ কইরা দিছেন।

নবাব পরিবারের বিভিন্ন চরিত্রের উপ্রে লাম্পট্যের দাগও দিছেন নিখিলনাথ। নবাব সরফরাজ নাকি তৎকালীন জগতশ্রেষ্ঠ ফতেচাঁদের নাতি মহাতপ রায়ের এগার বছরের স্ত্রীর রূপের কথা শুইনা তারে জোর কইরা ধইরা আইনা তার রূপ দেখছিলেন। এই কারনেই নাকি ফতেচাঁদের পরামর্শে আলিবদ্দী সরফরাজের মাইরা সিংহাসন দখল করেন (নিখিলনাথ, ১৩১৬ : ৫৭)। সিরাজউদ্দৌলাও নাকি জগৎশ্রেষ্ঠ মহাতপ রায়ের ঘূষি মারছিলেন। এইজন্য সিরাজের পতন হইছে (নিখিলনাথ, ১৩১৬ : ৬৫)। নিখিলনাথ সবচেয়ে নোংরা কাজটাও করেন, ঘসেটি বেগমের পাশাপাশি সিরাজের মার চরিত্র সম্পর্কেও ঢালাউ মন্তব্য করেন, এমন ইতরের ভাষায় যে, সেইটা নিয়া এইখানে আলোচনা করা রুচির কাজ হবে বইলা মনে হইতেছে না।

বাঙালির ইতিহাস লেখালেখিতে শ্রীনগেন্দ্রনাথ বসুর অনেক খন্দের বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস খুব মান্য বই। তার বিশ্বকোষেরও বিরাট সুনাম। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড) কলিকাতার বিশ্বকোষ প্রেস থাইকা ছাপা হয় ১৩২১ সালে, প্রিস্টার্ড হিসাবে ১৯১৪/১৫। নগেন্দ্রনাথের বইটা পড়তে গিয়া প্রথমেই আমার যেটা মনে হইছে তা হইল প্রাচীন বাংলাসহ গোটা ভারতে যে একটি সুষম, সুশৃঙ্খল জ্ঞানসাধক আর্য হিন্দু সমাজ তৈয়ার হইছিল এবং তারা মুসলমান আসার আগ পর্যন্ত সুন্দর শান্তিপূর্ণ জীবন যাপন করতেছিল এই কথাটা তিনি যতটা যত্নের সাথে খাড়া করতে চাইছেন আর কেউ সেইটা করতে পারেন নাই। অন্যরা এই বিষয়ে দাবি তুলছেন, পুরানকাহিনীগুলা থাইকা দু'একটা কথা তুইলা দিছেন, তার পক্ষে নিজের তাফসির হাজির করছেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ অনেক পুরানের সাক্ষ্য হাজির করছেন, গৌড়, রাঢ়সহ আরো অনেক অঞ্চলের কায়ছন্দের সিলসিলা উদ্ধারের চেষ্টা করছেন, ব্রাক্ষনদের বংশ পরিচয় বয়ান করছেন, প্রায় সাড়ে তিনশ কুলজী বই পইড়া তথ্য জোগাড়ের চেষ্টা করছেন। রীতিমত বিরাট আয়োজন। উদ্দেশ্য, বাংলাদেশের তথ্যাক্ষিত 'আর্য সমাজ'-এর ইতিহাস তৈয়ার করা। সমস্যা একটাই- তার অনেক উৎসই প্রামাণ্য না। সেই একই কায়দা: পুরানকাহিনী, কিংবদন্তী, ব্রাক্ষন কুলজী গ্রন্থ এইসবের কথারে ইতিহাসের বয়ান বানাইতে চাইছেন। আর্য সমাজের আলাপ শুরু করতে গিয়া তিনি লেখছেন:

रामायन-रचनाकाले गौड़मण्डले आर्य सभ्यता प्रसारित ओ ब्राह्मणवासेव मृत्युत्त हइयाहिल । रामायने शिखित आहे, अमुर्तरजा नामे चतुर्वंशीय एकजन राजा धर्मराष्ट्रेर निकटे आग्नेयातिथ्युर घृणन करेन । यजुर्वेदोर शतपथब्राह्मण-पाठे लक्ष्मी अतिथ्युर हईवे ये, उत्तरपाण्चमायल हईतेह आर्यसभ्यता जमश; पूर्वाभागते अवधित हईते थाके । एतप युने मध्ये गौड़मण्डल अतिक्रम करिया आग्नेयातिथ्युर अर्थात् अमरकृष्ण पिया आर्यराज अमुर्तरजा पूर घृणन करिलेन, अस्त मध्ये गौड़मण्डल तथन ये एकेवारे आर्य-उपनिवेश घृणित हय नाई, ताहा संज्ञवणर नहे । इहार अदिक्कृष्ण युन तथनां बनात्तुमि समाजेन ओ अनार्याशेवे लीलाक्षेत्रे घराण गण हइलेवे कोन कोन युने सामान्याभावे आर्यावास प्रतिष्ठित हईयाहिल, ताहा अदिक्कृष्ण संज्ञव बनियाही बोध हय । (नगेन्द्रनाथ, १३१८ : ५७)

त्राक्षन, ऋत्रिय ओ बैश्य लया ये आर्य समाजेव कथा बलहेन नगेन्द्रनाथ तार खाटिक्तुर गक्षेव अनेक कथा खाडा करहेन तिनि । जोर दिया बलहेन एकाखानेर त्राक्षनरा सब अवाङ्गालि, भारत धाइका आसहे, काजेह तादेव त्राक्षनत्तु निया शेष करा चले ना । एकाखाने भेजाल नाई, त्राक्षन छाडा अन्य कोन मानुषेर राजेव धारा एकाखाने सामाइते पारे नाई । तबे कोन कारने दुएक फोटा वाजे राजे चूइका थाकलेवे सेहेटा समुद्रे एक फोटा पानि, धरार मत किलु ना:

वजेर जातीय इतिहासे त्राक्षणकाणे आमि देखाइयाहि, कि वारेस्त, कि राटीय, कि बैदिक, कि शाकटीपी, कि जिवितिय, सकल श्रेदिर त्राक्षणेर वीज गूरुषाण केहेह गौड़वज्जेर आदि अधिवासी नहेन, सकलेह उत्तर-पश्चिम एदेश हईते एदेशे समागत, सकलेर धर्मगीतेह आर्याशेषित प्रवाहित । एदेशेर ज्ञवामू, आहार-वावहारेर उपे अनेक युने ताहादेव बंशधरगणेव मध्ये आर्यकात्रिर अठाव हइलेवे ताहारा ये एकृत आर्यसंघान, कूलशास्त्रसमूहेह ताहार यदेष्टे प्रकृष्टे प्रमाण । (नगेन्द्रनाथ, १३१८ : सूचना ४)

लक्ष्य करार मत, एकाखाने हिन्दुत्वादेव काहे देशश्रेम पुरा माईर थाया गेहे । खाटि त्राक्षनत्तु प्रमानेर लाइगा लेखक त्राक्षनदेव सवाइरे वाळार वाइरेर मानुष हिसावे सनद दिया दिलेन । आर्य-हिन्दूर वेडागिरिर काहिनी रचनार जन्य नगेन्द्रनाथ एकटू आलादा कोशल निहिलेन । अन्यरा येथाने आर्य-हिन्दूर वीरत्वेर विवरन दिले, सेहाने तिनि कायद्य समाजेव एमन एक छवि तुइला धरहेन याते केवल देश दखलेर वीरत्व ना, शिल्पसाहित्य, शहरपत्रन, व्यवसावानिज्य, समाज ओ देशशासन, ज्ञानसाधना, धर्मचर्चा- मोटकथा सभ्यतार सकल शाखाय तार श्रेष्ठत्वेर कथा बला हया गेहे । एই श्रेष्ठत्व निसन्देहे देशदखल आर खुनाखुनिर वेडागिरिर चेये अनेक बड आर सम्मानेर । नगेन्द्रनाथ कायद्यदेव आर्यत्वाव खाटि घोषना करहेन । काजेह कायद्यरा सेरा प्रमाणित हइले आर्य-हिन्दूह तो सेरा हइल ।

এজন্যই বললাম আর্য-হিন্দুর শ্রেষ্ঠত্বের কথাটা একটু আরেক রকম কইরা তুলছেন
নগেন্দ্রনাথ:

গৌড়বঙ্গের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মসাম্প্রদায়িক ইতিহাসে কায়স্তজাতি
সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন— সকল দিকেই তাহাদের প্রাধান্য, সকল
দিকেই তাহাদের আধিপত্য এবং সকল দিকেই তাহারা স্মরণীয় ও বরণীয়
হইয়াছিলেন। এখানকার কায়স্তসমাজ কেবল স্ব স্ব জাতীয় লেখ্যবৃত্তি দ্বারাই যে শ্রেষ্ঠতা
লাভ করিয়াছিলেন, অথবা কেবল রাজসেবা বা রাজবন্ধুভাষ্যক যে মহাসমৃদ্ধি লাভ
করিয়াছিলেন, তাহা নহে। জ্ঞানে-গুণে দয়াদাক্ষিণ্যে শক্তি-সামর্থ্যে, ধর্মে-কর্মে সকল
দিকেই এখানকার কায়স্ত সমাজ একদিন উল্লতির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাই
বলি গৌড়বঙ্গের ইতিহাসের প্রধান অংশই কায়স্ত সমাজের ইতিহাস। . . .
আকবরের অন্যতম সভাসদ ও ঐতিহাসিক আবুল ফজল কেবল তাহার সমসাময়িক
বাঙালার অবস্থা লিখিয়া ক্ষান্ত হন নাই। তিনি আরও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে,
মুসলমান আগমণের পূর্বে এই বঙ্গভূমি ১৯৩২ বর্ষকাল ভিন্ন ভিন্ন স্বাধীন কায়স্ত
রাজবংশের শাসনাধীন ছিল (নগেন্দ্রনাথ, ১৩২১ : ১১-১২)।

রীতিমত বিশাল এক দাবি। প্রাচীনকাল থাইকা বাংলার শাসনক্ষমতা কায়স্তদের
হাতে ছিল কি না সেই তর্ক এইখানে অবান্তর, কারন আমরা জানি আবুল ফজল
প্রাচীন বাংলার শাসনক্ষমতা নিয়া অনুমানে যে তথ্য লিইখা গেছেন সেইটা ভুল,
প্রাচীন বাংলার জানা ইতিহাসের শুরু থাইকা বৌদ্ধরা শাসন করছে, আর বৌদ্ধ
পালদের প্রায় চাইরশ বছরের ইতিহাস গোপন করার সুযোগ কই! এই বিষয়ে পরে
আলাদা আলাপ করছি।

হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস প্রকল্পের সবকে বেপরোয়া আবেগে পইড়া কেউ কেউ কিছুটা
বেসামাল কথাবার্তাও লেখছেন। যেমন দুর্গাচন্দ্র স্যান্যাল। বাংলার সামাজিক ইতিহাস
রচনার নামে তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের কিস্সা, কিংবদন্তী, গালগন্ন, সাধারণ মানুষের
কথাবার্তা নিয়া এমন সব বয়ান তৈয়ার করছেন যার লক্ষ্যই হইল মুসলমান শাসক ও
তাদের পরিবারের লোকজনদের হেয় করা। এমনকি বাংলার খ্যাতনামা সুলতানদের
কন্যাদের নিয়াও বাজে গল্প ফাদছেন তিনি।

সোলায়মান খান কররানীর (১৫৬৬-৭২) একজন দুর্ঘষ সেনাপতি ছিলেন
কালাপাহাড়, যার সাহস ও বীরত্বে বেশ কিছু যুদ্ধ জয় লাভ করে কররানীর
সেনাবাহিনী। ইতিহাসের তথ্য এইটুকুই। দুর্গাচন্দ্র ইতরামির মনোভাব থাইকা স্থানীয়
গনগন্ন, কিংবদন্তীর নাম ভাঙায়া এইরকম একটা কাহিনী লেখেন: ধর্মভীরু হিন্দু
কালাপাহাড় একদিন রাত্তি দিয়া হাঁইটা যাওয়ার সময় বাদশার কন্যা দুলারি তারে
দেইখা তার প্রেমে মশগুল হয়া যায়। কিন্তু কালাপাহাড় মুসলমান বিয়ে করবে না।

তাই জোর কইরা দুলালীর সাথে তার বিয়ে দেয়া হয় এবং এভাবেই কালাপাহাড়কে মুসলমান বানায়া সুলতানের পক্ষে আনা হয়।

দুর্গাচন্দ্রের এই সাম্প্রদায়িক বয়ান হিন্দু ইতিহাস লেখকরাও বাতিল কইরা দিছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদারও বলছেন এইগুলা গালগন্ধি। এইরকম অনেক ইতরসূলভ গন্ধি আছে দুর্গাচন্দ্রের বইটাতে। আসলে বাঙালার সামাজিক ইতিহাস-এ দেয়া নানা বয়ান কতকটা প্রলাপের মতই। এই কারণে এই বই নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করা অদরকারী।

শ্রীরজনীকান্ত চক্ৰবৰ্তির গৌড়ের ইতিহাস প্রথমখণ্ড হিন্দু রাজত্ব বইটারে অনেকে বলেন বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস। তাইলে দেখা যাক প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস কেমন লেখছেন রজনীকান্ত।

শ্রীরজনীকান্ত চক্ৰবৰ্তির গৌড়ের ইতিহাস প্রথমখণ্ড হিন্দু রাজত্ব বাইর হয় ১৩১৭ সালে। রজনীকান্ত হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস প্রকল্প এক ধাপ আগায়া নিয়া যান বইয়ের শিরোনামে। গৌড়ের ইতিহাসের প্রথমখণ্ডে ১২০০ সাল পর্যন্ত বাংলার ইতিহাস আলোচনা করা হইলেও সে যুগের নাম দেওয়া হয় ‘হিন্দু রাজত্ব’। অর্থ জানা ইতিহাসে সেনদের আগে কোন হিন্দু শাসক বাংলায় নিরস্কৃত শাসন কায়েম করতে পারেন নাই। সেনরা ক্ষমতায় আছিল আশি বছরের মত। পালেরা ছিল সাড়ে তিনশ বছরের চেয়েও বেশি। পালদের আগেও ছোট ছোট বৌদ্ধ রাজ্য ছিলো। হিন্দুধর্মী সেনদের আশি বছরের শাসন ক্ষমতার উপ্রে নির্ভর কইরা রজনীকান্ত বাংলার বারোশ বছরের ইতিহাসে সোজা ‘হিন্দু রাজত্ব’ বানায়া দিলেন। বাংলার সকল বৌদ্ধ রাজাদের শাসনকালকে ‘হিন্দু রাজত্ব’ নামে গিইলা ফেলার কারন কি? বঙ্গিমচন্দ্রের সেই হিন্দুত্ববাদী প্রকল্প: ভারত-বাংলায় প্রাচীন কাল থাইকা চলমান একটা হিন্দু রাজত্ব ও আদর্শ হিন্দু সমাজের কাল্পনিক বয়ান তৈরির চেষ্টা।

অবশ্য রজনীকান্ত জেমস মিলের (১৭৭৩-১৮৩৬) *The History of British India* দ্বারা উৎসাহিত হয়া থাকতে পারেন। ভারতের ইতিহাস হিন্দু যুগ, মুসলিম যুগ ও বৃটিশ যুগ এই তিনভাগে আলোচনা করেন ক্ষটিশ অর্থনীতিবিদ ও ইতিহাসবিদ মিল। মিল কোনদিন ভারতে আসেন নাই। সেই যুগে ভারতবিদ বা প্রাচ্যবিদ হওয়ার স্বপ্ন ছিল অনেক ইউরোপীয় লেখকের। জেমস মিল ভারতের ইতিহাস লেখেন নিজের দেশে বইসা। হাতের কাছে যেসব বিবরন পাওয়া গেছে নিশ্চয়ই সেইটাই তার লেখার সম্পূর্ণ ছিল। কিন্তু রজনীকান্ত বাংলার মানুষ। তার সময়ে বাংলার ইতিহাসের অনেক বইপত্র বাইর হইছে। আমাদের জানার সীমা বাড়ায়া দিছে নতুন নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার। যার অর্থ হইল রজনীকান্ত ইচ্ছা কইরাই প্রাচীন বাংলার ইতিহাসের অংশটার নাম দিছেন হিন্দু রাজত্ব। এই রকম খাড়া মিছা কথারে ইতিহাসের সত্ত হিসাবে চালায়া দেয়ার চেষ্টা দেখা যায় রজনীকান্তের বইয়ের নামকরণে।

বইটায় তিন চার হাজার বছর আগের বাংলাদেশের বিবরন লেখা হইছে ঋকবেদ, অর্থবেদ, রামায়ন, মহাভারত এইগুলা থাইকা কথাবার্তা নিয়া। লেখক এমনভাবে এইসব বইয়ের উল্লেখ কইরা বিবরন দিছেন মনে হয় যেন এইগুলা ইতিহাসের বই, যেন সন তারিখ ঠায়ঠিকানা দিয়া লেখা বয়ান। বিবরনের বিষয় একই: সুপ্রাচীন কালেই বাংলাদেশে আর্য জাতির প্রতিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠত্ব। এইখানে বইয়ের লেখা একটু তুইলা দেই:

বৈদিক সময়েও বঙ্গ আর্যগণের পরিজ্ঞাত ছিল। তবে, তখন বঙ্গে রাক্ষসপ্রকৃতির লোকের বাস ছিল, বেদের প্রাচীন ভাষ্যকারগণ ইহা বিশ্বাস করিতেন। মহাভারতের বন পর্বের তীর্থ্যাত্রা প্রকরণে আছে, পরশুরাম লৌহিত্যতীর্থ সৃষ্টি করেন। সম্ভব হয়, পরশুরাম প্রথম এইদেশে একটি আর্য উপনিবেশ স্থাপন করেন। রামায়নে বঙ্গের নাম আছে। পুরান অনুসারে রামায়নের রচনাকাল খ. পূ. ২০০০ বছর। রামায়নে দশরথ বলিতেছেন অঙ্গ, বঙ্গ, কাশী, কোশল প্রভৃতির রাজারা তাহার অধীন ছিল।

বঙ্গদেশের পার্শ্বদেশ দিয়া হিমালয়ের পাদদেশ পর্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল, এই সমুদ্রকে লৌহিত্য বা লৌহিত সাগর বলিত। মহাভারতে অর্জুনের দিগ্বিজয়-প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে অর্জুন সপ্তদ্঵ীপের রাজগণকে পরাজিত করিয়া প্রাগজ্যোতিষপুর অধিকার করেন। এই সপ্তদ্বীপ সম্ভবতঃ লৌহিত সাগরস্থ সপ্ত উচ্চ ভূখণ্ড; এখন উহা বঙ্গদেশের অঙ্গর্গত হইয়াছে। মনুর সময় আর্যজাতি ইহার পূর্বদিকে বসতি বিস্তার করেন নাই। মনু আর্য্যাবর্তের পূর্বসীমায় যে সমুদ্র উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এই লৌহিত্য সমুদ্র। মনু লিখিয়াছেন- . . . (রজনীকান্ত, ১৩১৭ : ২৩)।

অবস্থা দেখেন! রামায়ন মহাভারতের কাহিনীরে অবলীলায় ইতিহাস হিসাবে বয়ান কইরা গেছেন। শেষে 'মনু লিখিয়াছেন' কথাটা এমনভাবে জুইড়া দিছেন সাধারণ পড়ুয়াদের হয়ত মনে হইতে পারে মনু নামে একজন নির্ভরযোগ্য লেখক ছিলেন বা আছেন। অথচ মনু পুরানের একটা নাম, যার অর্থ একেক বইয়ে একেক রকম। তবে সাধারণভাবে মনু বলতে বুঝায় প্রথম মানুষের নাম।

বাংলার রাজপুত্র বিজয় সেন শ্রীলংকায় গিয়া উপনিবেশ স্থাপন করার যে পুরান কথা পাওয়া যায় সেইটারেও ইতিহাস হিসাবে হাজির করতে ভুলেন নাই রজনীকান্ত। কারন বক্ষিম বাঙালির বীরত্বের যেসব শর্ত দিছেন তার মধ্যে বাঙালি কর্তৃক অন্যদেশে উপনিবেশ বসানোর কথাও আছে। তাই রজনীবাবু সেই কথাও তুইলা ধরেন, বিজয়ের ক্লপকথা অবলম্বনে।

হিন্দুত্ববাদীদের আরেক মাথাব্যথা বখতিয়ার খিলজির কাছে লক্ষণসেনের পরাজয়। তাই ইতিহাস চর্চার শুরু থাইকাই তাদের চেষ্টা হইল বখতিয়ার খিলজির বাংলা জয়ের ঘটনারে গালগল্প বইলা উড়ায়া দেয়া। বক্ষিমই প্রথম বলেন যে

বখতিয়ার খিলজীর বাংলা বিজয় হইল একটা কল্পকাহিনী। রজনীকান্ত তার পুনরাবৃত্তি করেন, তবে একটু অভিনব উপায়ে। তিনি কোন তথ্যসূত্র ছাড়াই লেখেন:

সে সময় লক্ষণ সেন পূর্ববঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সমগ্র গৌড়রাজ্যের কিয়দংশ হস্তবহির্ভুত হইলেও, তিনি তাহার দাবী পরিত্যাগ করেন নাই। . . . সচরাচর ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে গৌড়নগর মুসলমানদের অধিকৃত হয়, এইরূপ বলা হয়। মুসলমানেরা এই অন্দে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করে। লক্ষণ সেনের কোন পুত্র গৌড়ে অবস্থান করিয়া দীর্ঘকাল মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে (৬০২/৩ হিজরায়) গৌড়নগর সম্পূর্ণরূপে মুসলমানদের অধিকৃত হয়। (রজনীকান্ত, ১৩১৭ : ১৯৪-৯৫)।

রজনীকান্ত মিনহাজের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরন বাদ দিয়া নিজে এমন এক কথা বানাইলেন যার কোনো উৎস নাই, প্রমান নাই। বখতিয়ারের আক্রমনের সময় লক্ষণ সেন নদীয়ায় ছিলেন না, এই কথা তিনি কোথায় পাইলেন? আর লক্ষণ সেনের 'কোন এক পুত্র' দীর্ঘকাল মুসলমানদের ঠেকায়া রাখছিলো সেই খবর কার কাছ থাইকা নিলেন রজনীবাবু? এইখানে তারা মিনহাজের বিবরনের ভ্রান্তে করতেছেন না, কিন্তু লেখার অন্যান্য অংশ মিনহাজ ও আর সব মুসলমান ইতিহাস লেখকদের বই থাইকা নেয়া। অবশ্য রমাপ্রসাদও এই সন্দেহটা করছেন, তবে তার পিছনে যুক্তি দেয়ার চেষ্টা করছেন। রজনীকান্তের মত 'ইতিহাসের সত্য' হিসাবে তুইলা ধরেন নাই।

এইবার তাদের ইতিহাস প্রকল্পের শেষ লক্ষ্যটা নিয়ে কথা বলি যেটার প্রথম অপপ্রচারনার শুরু বক্ষিমের লেখায়। সেইটা হলো আদি বাঙালিদেরকে দস্য, অসভ্য, ইতর, ও আর্যদের দাস হিসাবে প্রচার করা। অর্থাৎ সেই ফরমূলা: বাঙালির ইতিহাস চাই, এমন ইতিহাস চাই যেখানে হিন্দুর বীরত্বের কথা থাকবে, হিন্দুর আর্যত্বের কথা থাকবে, পুরাকাল থাইকা বাংলায় আর্যদের অধিকারের কথা থাকবে, কোন মুসলমানের কাছে হিন্দুর পরাজয়ের কথা সেইখানে থাকতে পারবে না। এই ইচ্ছা পুরন করার জন্য রজনীকান্তকে মুসলমান ইতিহাস লেখকদের লেখা ইতিহাসে প্রয়োজনমত বদল আনতে হয়, কোনো কোনো জায়গায় ইতিহাস নিজের মত কইরা বানায়া নিতে হয়।

রজনীকান্তের বইটা পড়ার সময় এই সময়ের সচেতন ইতিহাস পাঠকের কাছে আঁকা মনে হইতে পারে তিনি হয়ত রূপকথা পড়তেছেন। কিন্তু পরের কোনো কোনো লেখক ও পড়ুয়া তাঁর এই বইয়ের বাংলার প্রথম পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস বইলা চালাইছেন এবং এখনো চালাইতেছেন। কেন যে তারা এইডারে বাংলার প্রথম ইতিহাস বলছেন সেইটা বুঝে আসতেছে না। এই বইয়ে তো প্রচুর গালগালও আছে যেগুলা ইতিহাসের বইয়ে থাকার কথা না। যেমন এক জায়গায় তিনি বলতেছেন রামায়ন খ. পৃ. ২০০০ বছর আগের রচনা। অর্থাৎ রামায়নের সবচেয়ে প্রাচীন

পাঞ্জুলিপিটার বয়স মাত্র সাড়ে আটশ বছর, মহাভারতের পাঞ্জুলিপির বয়স আরো কম, বেদেরও। অর্থাৎ সাতআটশ বছরের পুরানা পাঞ্জুলিপির বরাত দিয়া আড়াই-তিন হাজার বছর আগের বাংলাদেশের ইতিহাসের বয়ান।

আরেক খ্যাতিমান ইতিহাসকার রাখালদাস বন্দেয়াপাধ্যায়। তার বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম খন্দ বাইর হয় ১৯১৪ সালে, দ্বিতীয় খন্দ ১৯১৭ সালে। পুরাকালের খুদাইলেখা বা পাঞ্জুলিপি পইড়া অর্থ বুঝার কাজে বেশ উন্নাদি কামাইছিলেন রাখালদাস, এইরকম একটা কথা চালু আছে। তাঁর বই পড়লেও মনে হয় সঠিক তথ্য গ্রহণ ও তার নিরপেক্ষ তাফসির তৈয়ার ছাড়া যে আদত ইতিহাসে পৌঁছানো সম্ভব না সেই কথাটা তিনি বিশ্বাস করতেন, বুঝতেনও। তবু যুগের ক্ষয়রোগ হিন্দুত্ববাদী জাগরণের কামড় থাইকা তিনিও বাঁচতে পারেন নাই। তাই হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস বানানোর প্রকল্প বাস্তবায়নে তাঁর কি দান সেইটা দেখা দরকার।

তার আগের লেখকদের মত রাখালদাসও পুরান লোকসাহিত্য ইত্যাদির গল্পকাহিনীর এক আধটু উল্লেখ সামনে তুইলা ধইরা বাংলাদেশে আর্য আধিপত্যের কাল্পনিক ইতিহাস তৈয়ার করছেন। তিনি লেখছেন:

কেহ কেহ অনুমান করেন যে, মগধের দক্ষিণ অংশের প্রাচীন নাম কীকট। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে ঝগ্নের তৃতীয়ষষ্ঠক রচনাকালে পঞ্চনদ ও মধ্যদেশবাসী আর্যগন মগধ দেশের অন্তিমের কথা অবগত ছিলেন। অথর্ববেদসংহিতার পঞ্চম কাণ্ডে অঙ্গ ও মগধদেশের নাম আছে; সুতরাং ইহা স্থির যে, এই সময়ে অঙ্গ ও মগধ দেশ আর্যগনের নিকট পরিচিত হইয়াছিল (রাখালদাস, ১৪০২: ১৫)।

এইটুকু ভূমিকা করার পর রাখালদাস শ্রীলঙ্কায় উপনিবেশ বানানোর সেই রূপকথা অবলম্বনে বাংলায় আর্যদের ইতিহাস নির্মানের চেষ্টা করেন এইভাবে:

সিংহলের ইতিহাস হইতে জানিতে পারা যায় যে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিদে বিজয়সিংহ নামক বঙ্গদেশীয় কোন রাজপুত্র সিংহলে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। এই ঘটনার মূলে সত্য আছে কি না তাহা বলিতে পারা যায় না, তবে ইহা যদি প্রকৃত হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে মগধে ও বঙ্গে আর্য সভ্যতা প্রচারিত হইয়াছিল। বিজয়সিংহ নাম অনার্য নাম নহে, সুতরাং তাহার জন্মের পূর্বেই বঙ্গ, মগধের প্রাচীন অধিবাসীগণ পুরাতন ভাষা ও রীতিনীতি পরিত্যাগ করিয়া আর্যজাতির আচার ব্যবহার ও ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।” (রাখালদাস, ১৪০২: ১৮)।

আদি বাঙালিরা বিজয়ী আর্য জাতির ‘দাসে পরিণত হইয়াছিল’ কথাটা বলেন নাই, কিন্তু ‘আর্যদের ধর্ম ও আচার নিজেদের কইরা নিছিল’ এই দাবীটা করছেন

রাখালদাস। তবে বখতিয়ার খিলজীর বাংলা জয়ের ব্যাপারে তার কথা পরিকার। তিনি লেখছেন:

মোহম্মদ-ই-বখতিয়ার কর্তৃক গৌড়ে ও রাঠে সেন রাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু যেভাবে বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা নদীয়া কোথায়? নদীয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয় যে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ার লুষ্টনাদেশে আসিয়া সেন রাজের জনেক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন; কারণ নবদ্বীপ যে সেন রাজবংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কার হয় নাই। . . . তৃতীয় কথা লক্ষণসেন তখন জীবিত ছিলেন না। . . . এই মাত্র বলা যাইতে পারে, মহম্মদ-ই-বখতিয়ারের নদীয়া বিজয় কাহিনী সম্ভবত অলীক (রাখালদাস, ১৪০২: ২২২)।

হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসের আরেকটা লক্ষ্য ছিলো এই কথা ইতিহাস হিসাবে প্রচার করা যে, সমাজের নিম্নশ্রেণির লোকেরা মুসলমান হয়া মুসলিম সমাজ গইড়া তুলছে। বেভারলির বরাতে বঙ্গিম-রাজকৃষ্ণর এই প্রবণতা রাখালদাসরেও আছুর করছে:

গৌড় ও বঙ্গে নিম্নশ্রেণীর জনসমাজ মুসলমান পীর ও ফকিরগণের অত্যাচারের ভয়ে মুসলমান ধর্মে হিন্দু ধর্মের কঠোরতার অভাব দেখিয়া এবং মুসলমান-শাসিত রাজ্যে উচ্চজাতীয় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান ধর্মাবলম্বী ইতরশ্রেণীর ব্যক্তিগণের অধিকতর সমাদর দেখিয়া মুসলমান ধর্ম অবলম্বন করিয়াছিল (রাখালদাস, ১৪০২: ৯৫)।

বন্ধুত্ব অই কালের বহু ইতিহাসকারই হিন্দুত্ববাদী ভাবনার বাইরে যাইতে পারেন নাই। উনিশ শতকের সাহিত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের সূচনটাই হইছিলো আর্য-হিন্দু ভারতের ধারনা কেন্দ্র কইরা। সেইকালের পত্রপত্রিকা, বই, সভাসমিতি কোনো কিছু অই উত্তাপ থাইকা বাঁচতে পারে নাই। জ্ঞানচর্চার সেই পরিবেশে নয়া প্রজন্মের যারা শিক্ষাদীক্ষা নিছেন তারাও সেই ছাঁচে আকার পায়া বাইর হইছেন। তাদের লক্ষ্যে পরিনত হয় আর্য-হিন্দু ভারতের ইতিহাস লেখা। যা ছিল না তার ইতিহাস তৈয়ার করতে চাইলে কল্পনা, পুরান, লোককাহিনী, কিংবদন্তীর আশ্রয় নিতে হবে সেইটাই স্বাভাবিক।

বাঙালির ইতিহাস চর্চায় বঙ্গিম্ব চট্টোপাধ্যায়ের হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস-ভাবনার পরিনাম বুঝার জন্য আর একজন ইতিহাস লেখকের লেখা দিয়া আলাপ শেষ করব। তিনি রমেশচন্দ্র মজুমদার। অনেকে তারে অসাম্প্রদায়িক ইতিহাসকারই বলেন। বাংলা দেশের ইতিহাস বাইর হওনের পরে যিনিই ইতিহাস লেখতে যান তিনিই রমেশ বাবুর বইয়ের মতামতের কাছাকাছি কথার চেষ্টা করেন, এতটাই বিশ্বস্ততা ও পোক জায়গা তার আমাদের ইতিহাসজ্ঞানে।

বাংলাদেশের একটা ইতিহাস লেখার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থাইকা উদ্যোগ নেয়া হয় ১৯৩৫ সালে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় ১৯৪৩ সালে বাইর হয় *History of Bengal, Vol-I Hindu Period*, একেবারে আদিকাল থাইকা ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস। যদুনাথ সরকারের সম্পাদনায় *History of Bengal, Vol-II Muslim Period* ছাপা হয় ১৯৪৮ সালে। একটা বিষয় লক্ষ্য করা দরকার, রজনীকান্তের মত রমেশচন্দ্রও বহিরাগত হিন্দু সেনদের আশি বছরের শাসনরে নির্ভর কইরা প্রায় হাজার দেড়েক বছরের ইতিহাসের নাম দিছেন ‘হিন্দু পিরিয়ড’। চাইরশ বছরের বৌদ্ধ শাসন, তার আগে বিভিন্ন ছোট ছোট রাজ্যে বৌদ্ধ রাজাদের রাজত্ব, খ্রিস্টের জন্মেরও আগের দুই-তিনশ বছরের স্থানীয় অঞ্চল শাসকদের কীর্তি—সবই ‘হিন্দু পিরিয়ড’ নামে বেমালুম গিইলা ফেলা হইছে। পরে রমেশচন্দ্র মজুমদার বাংলা ভাষায় প্রাচীন বাংলার ইতিহাস নিয়া লেখছেন বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) প্রথমখন্ড। তার নিজের লেখা বাংলা বইটায় কিন্তু ‘হিন্দু পিরিয়ড’ কথাটা নাই। আমরা এই বইটা নিয়া কিছু বলব।

বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ) প্রথমখন্ড বইয়ে ‘হিন্দু পিরিয়ড’ কথাটা না থাকলেও প্রাচীন কাল থাইকা ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময় বুঝাইতে রমেশচন্দ্র দেদারসে ‘হিন্দুযুগ’ ও ‘প্রাচীন হিন্দুযুগ’ কথাটা ব্যবহার করছেন, একবারও বৌদ্ধযুগ লেখা হয় নাই। অর্থাৎ মুসলমান আমলের আগে গোটা ভারতের মত বাংলাদেশেও একটা সুষ্ঠ আর্য-হিন্দু সমাজ আছিল সেই কথাটাই সোজাসুজি না কয়া ঘুরায়া কইছেন রমেশচন্দ্র। এর পরেই তিনি বাংলাদেশে আর্য-হিন্দুর বসতি এবং বাংলায় আর্যসভ্যতার বিস্তারের পক্ষে কথা শুরু করেন তিনি। যথারীতি তার কথাবার্তার উৎসও সেই হিন্দু পুরান, ধর্মীয় লোককাহিনী ইত্যাদি। তিনি লেখছেন:

বৈদিক যুগের শেষভাগে অথবা তাহার অব্যবহিত পরেই বাংলা দেশে আর্য উপনিবেশ ও আর্য সভ্যতার বিস্তার হয়। বৈদিক ধর্মসূত্রে বাংলাদেশ আর্যবর্তের বাহিরে বলিয়া গণ্য হইলেও মানবধর্মশাস্ত্রে ইহা আর্যবর্তের অন্তর্ভুক্ত এবং পুন্ন জাতি পতিত ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মহাভারতে কিন্তু পুন্ন বঙ্গ এই উভয় জাতিই ‘সুজাত’ ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত হইয়াছে (রমেশচন্দ্র, ১৩৮০ : ১৭)।

এরপর তিনি মহাভারতের বরাত দিয়া অঙ্গুত এক কাহিনী তুইলা দেন। যেখানে পূর্বদেশের বলী নামের এক রাজার অনুরোধে বৃক্ষ ঋষি দীর্ঘতমা বলী রাজের রাণীর সাথে দৈহিকভাবে মিলিত হয়া পাঁচ পাঁচটি ছেলে জন্ম দেন। তাদের নাম অঙ্গ, কলিঙ্গ, পুন্ন, সুক্ষ, ও বঙ্গ। বঙ্গের নামে নাকি বঙ্গদেশ হইছে। রমেশবাবু কাহিনীটা অবিশ্বাস্য বলছেন, কিন্তু এই কাহিনী নাকি প্রমাণ করে যে মহাভারতের সময় বাংলায় আর্য উপনিবেশ হয়া গেছিল। এরপরে তিনি লেখেন:

চার

বঙ্গিমচন্দ্র যে চাইরটা বিষয়ে আন্দাজি বয়ানরে ইতিহাসের সত্য হিসাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছিলেন সেইগুলার কি হইল বুঝা দরকার। হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস লেখা শুরু হওয়ার পর বঙ্গিমের এই চাইর খোঁক বাঙালির ইতিহাস চর্চার গোটা বিষয়টারে গভীরভাবে প্রভাবিত কইরা নানা বিভ্রমের মধ্যে ফালায়া রাখছে। এইখানে কয়েকজন নামকরা ইতিহাসলেখকের নির্বাচিত ইতিহাস বই থাইকা নমুনা নিয়া বাঙালির প্রচলিত ইতিহাসের অবস্থাটা দেখানোর চেষ্টা করবো।

প্রথমে ইতিহাস হিসাবে কম গুরুত্ব পাওয়া একটা বই নিয়া কিছু বলি। বইটার নাম রাজাবলী, লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালক্ষ্মা, ছাপা হয় ১৮০৮ সালে। ১৮৮৯ সালের পদ্ধতি সংস্করনে বইটার পরিচয় দিতে গিয়া লেখা হয়, “কলির প্রারম্ভ হইতে ইংরাজের অধিকার পর্যন্ত ভারতবর্ষের রাজা ও স্মাটদের সংক্ষেপ ইতিহাস”। লেখক লেখছেন তার বইয়ে কলিযুগের গত ৪৯০৫ বছরের রাজা বাদশাদের বিবরণ দেয়া হইছে। তবে মুসলমান ইতিহাসবিদদের বিবরনের বাইরে যা কিছু আছে সবই পুরান থাইকা নেয়া। অর্থাৎ পুরানরে ইতিহাস বানানোর প্রথম চেষ্টা মৃত্যুঞ্জয় করেন। বইটা হিন্দুস্থানের ইতিহাস নিয়া লেখা। বাংলাদেশ প্রসঙ্গ যতাখানি লেখা আছে তার মধ্যে সিরাজউদ্দৌলার বিবরণ থাইকা একটু এইখানে দেই:

“তাহার পর তাহার দৌহিত্রি শিরাজউদ্দৌলা ঐ সনে তিনি সুবার সুবেদার হইলেন (।) বিশিষ্ট লোকদের ভার্যা ও বধু ও কন্যা জোর করিয়া আনাইবাতে ও কৌতুক দেখিবার নিমিত্তে গভীণী স্ত্রীদের উদর বিদারণ করণেতে লোকেতে ভরা লৌকা ডুবাইয়া দেওয়ানেতে দিনে দিনে অধর্ম্ম বৃদ্ধি হইতে লাগিল” (মৃত্যুঞ্জয়, ১৮৮৯ : ১৫৬)।

আমরা বুঝতে পারতেছি বিবরণগুলা বিশ্বাসযোগ্যভাবে দিতে পারেন নাই বইলা এই বইয়ের তেমন প্রচার হয় নাই। আমরা সেই সময়ের তথাকথিত উঁচা জাতের হিন্দুদের সংখ্যালঘু অংশটার ইতিহাস চর্চার প্রবনতাগুলা চিহ্নিত করার লাইগা এইটা নিয়া আলোচনা করলাম। সেইখানে দুইটা বিষয় পাওয়া যাইতেছে, এক: মুসলমান শাসকদের নামে কৃৎসা ছড়ায়া তাদের হীনচরিত্র হিসাবে দেখানো, দুই: হিন্দুর বেডাগিরির প্রমাণ হিসাবে পুরানের গল্পগুলিতে ইতিহাস বইলা চালায়া দেয়ার চেষ্টা। তবে রাজাবলী ভারতের সম্পর্কে পুরাকাহিনীর গল্প, বাংলার ইতিহাস না।

থাকে। বাঙালী সমাজের নিম্নতরেই বাঙালী অনার্য বা মিশ্রিত আর্য ও বাঙালী মুসলমান। (বঙ্গিমচন্দ্র, ১৯৯১: ৩৬৩)

প্রথম উদ্ধৃতিতে বঙ্গিম গোটা মুসলমান জাতের আত্মগৌরবে কানা, মিথ্যক, হিন্দুবিদ্বেষী বইলা রায় দিচ্ছেন। সেই কারণে তাদের লেখা ইতিহাস হইল মিথ্যা কাহিনী। কাজেই বাংলা ও বাঙালির ইতিহাস হিসাবে তা মানা যাবে না। যে মানবে তার বাঙালিত্ব বাতিল হয়া যাবে। এইখানে বইলা রাখি যে, ‘মুসলমানের লেখা ইতিহাস যে মানবে সে বাঙালি না’- এই জাতের ফতোয়ারে ফ্যাসিস্ট বিবৃতি বলা যায় যেটা আদতে মানুষের মতামত জানানোর অধিকার হরন করে।

মনমত ইতিহাসের সন্ধান কোথায় করতে হবে তার একটা নির্দেশনা বঙ্গিমচন্দ্র দিচ্ছেন। তিনি মনে করতেছেন বাঙালির একটা অংশ খাঁটি আর্য- ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যরা। কাজেই জানতে হবে আর্যরা কবে এইদেশে আসছে, আর চাঁড়াল, মুচি ডোম এরা কইথাইকা আসছে। এইসব খোঁজার জন্য পুরান, ইতিহাস এবং নৈয়ায়িক, স্মার্ত, জ্যোতিষী, দার্শনিক এদের লেখা বই পড়ার দিকে ইঙ্গিত করছেন। অর্থাৎ মধ্যযুগে ব্রাহ্মণদের লেখা যেসব বইপত্রে সৈশ্বরের নির্দেশনার মিছা দোহাই দিয়া মানুষরে উঁচাজাত নিচাজাতে ভাগ করা হইছে সেইসব বইয়েই তিনি ইতিহাসের সন্ধান করতে বলতেছেন। আবার, এইসব বইয়ের কথা বইলা প্রাচীন ভারতে একটা আদর্শ জ্ঞানবাদী হিন্দু জনসমাজ থাকার দাবী আলগোছে চালায়া দিচ্ছেন। আমরা জানি ভারতের পুরান, ন্যায়শাস্ত্র, জ্যোতিষবিদ্যা, স্মার্তবিদ্যা- সবই হিন্দু ধর্মচর্চার বিষয় হিসাবে গইড়া উঠছিলো, কিছু আবার বৌদ্ধধর্মেরও ফসল। যার অর্থ দাড়ায় বঙ্গিম বাবু হিন্দু বেভারলির ইতিহাস খুঁজতে কইছেন হিন্দু পুরানে, রামায়ন, মহাভারত, ধর্মীয় লোকসাহিত্যে।

শেষ উদ্ধৃতিটাতে বঙ্গিমের উগ্র সাম্প্রদায়িক চরিত্র ন্যাংটা হয়া ধরা পড়ছে। সেইখানে বঙ্গিম বলছেন অধিকাংশ মুসলমান নিচু জাতের। এর অর্থ দাড়ায় খালি নিচু জাতের মানুষ মুসলমান হইছে। এই কথাটা বঙ্গিম নিছেন বাংলার প্রথম আদমশুমারিকার বেভারলি থাইকা। আগে মনে করা হইত বাংলা হিন্দুর দেশ, এইখানে হিন্দু বেশি। ১৮৭২ সালের আদম শুমারিতে দেখা গেল বাংলা প্রদেশে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশি। এই কথা শুইনা হিন্দুবাদীরা বিস্মিত এবং আহত হন। বেভারলির শুমারি ভুল বইলা সমালোচনা শুরু করেন অনেকে। পরিস্থিতি যে এমন হইতে পারে তেমন একটা ধারনা বেভারলি করতে পারছিলেন মনে হয়। তাই আগেই ভূমিকায় বইলা রাখছিলেন যে, নিম্নশ্রেণির প্রচুর হিন্দু মুসলমান হওয়ায় মুসলমানের সংখ্যা বাইড়া গেছে। পরে আমরা এই তত্ত্বের অসারত্ব নিয়া বিস্তারিত আলোচনা করছি, তাই এইখানে আর না বলি।

কোন্ কোন্ ধর্ম প্রচলিত ছিল, বৈদিক, বৌদ্ধ, পৌরাণিক, চার্কাক, বৈষ্ণব শৈব, অনার্য, কোন্ ধর্ম কত দূর প্রচলিত ছিল? শিক্ষা, শাস্ত্রালোচনা কত দূর প্রবল ছিল? কোন্ কোন্ কবি, কে কে দার্শনিক, স্মার্ত নৈয়ায়িক, জ্যোতিষী জনগ্রহণ করিয়াছিলেন? কোন্ সময়ে জনগ্রহণ করিয়াছিলেন? কি কি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন? তাঁহাদিগের জীবনবৃত্তান্ত কি? তাঁহাদিগের এন্হের দোষ ও গুণ কি কি? তাঁহাদিগের এন্হ হইতে কি শুভাশুভ ফল জন্মিয়াছে? বাঙালীর চরিত্র কি প্রকারে তদ্ধারা পরিবর্তিত হইয়াছে? (বঙ্গিমচন্দ্র, ১৯৯১: ৩৩৭-৩৮)

অনেক কথার সাথে এই কথাগুলা আলগোছে বইলা গেছেন বঙ্গিমচন্দ্র। এইজন্য বাছাই জায়গাগুলা তুইলা ধরলাম যার নির্দেশনা হইল বাঙালির ইতিহাস ধর্মের বইয়ের মধ্যেও খুঁজতে হবে। সবশেষে তার লেখার ভয়ংকর ইঙ্গিতময় একটা দিক উল্লেখ করব:

আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্বৃত্তি হইল? এ রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে, দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কে লিখিয়াছিল? কাহার জীবনচরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিবিল কেন? নিবিল বুঝি মোগলের শাসনে। হিন্দু রাজা তোড়লমণ্ডের আসলে তুমার জমার দোষে। সকল কথা প্রমাণ কর। . . . এখন ত দেখিতে পাই, বাঙালার অর্দেক লোক মুসলমান। ইহার অধিকাংশই যে ভিন্ন দেশ হইতে আগত মুসলমানদিগের সন্তান নয়, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেন না, ইহারা অধিকাংশই নিম্নশ্রেণীর লোক- কৃষিজীবী। রাজার বংশাবলী কৃষিজীবী হইবে, আর প্রজার বংশাবলী উচ্চশ্রেণী হইবে, ইহা অসম্ভব। দ্বিতীয়, অল্পসংখ্যক রাজানুচরবর্গের বংশাবলী এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বিশ্রৃতি লাভ করিবে, ইহাও অসম্ভব। অতএব দেশীয় লোকেরা যে স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান হইয়াছে, ইহাই সিদ্ধ। দেশীয় লোকের অর্দেক অংশ কবে মুসলমান হইল? কেন স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিল? কেন মুসলমান হইল? কোন্ জাতীয়েরা মুসলমান হইয়াছে? বাঙালার ইতিহাসে ইহার অপেক্ষা গুরুতর তত্ত্ব আর নাই। (বঙ্গিমচন্দ্র, ১৯৯১: ৩৩৯-৪০)

এইখানে বঙ্গিম আকারে ইঙ্গিতে বলতে চাইছেন বাঙালি মুসলমানের বেশিরভাগই নিম্নশ্রেণির কৃষিজীবী বইলা ধইরা নেয়া যায় এরা নিম্নশ্রেণির হিন্দু থাইকা মুসলমান হইছে। আরেক প্রবন্ধে তিনি সেইটা খোলাখুলিই লেখেন:

বাঞ্ছবিক এক্ষণে যাহাদিগকে আমরা বাঙালী বলি, তাহাদিগের মধ্যে চারি প্রকারের বাঙালী পাই। এক আর্য্য, দ্বিতীয় অনার্য্য হিন্দু, তৃতীয় আর্য্যানার্য্য হিন্দু, আর তিনের বার এক চতুর্থ জাতি বাঙালী মুসলমান। চারিভাগ পরস্পর হইতে পৃথক

আর্যগণের উপনিবেশের ফলে আর্যগণের ভাষা, ধর্ম, সামাজিক প্রথা ও সভ্যতার অন্যান্য অঙ্গ বাংলাদেশে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রাচীন অনার্য ভাষা লুপ্ত হইল, বৈদিক ও পৌরাণিক এবং বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম প্রচারিত হইল, বর্ণাশ্রমের নিয়ামানুসারে সমাজ গঠিত হইল- এক কথায় সভ্যতার দিক হইতেও বাংলাদেশ আর্যবর্তের অংশরূপে পরিণত হইল। পৃথিবীর ইতিহাসে দেখা যায় যে, যখন কোন প্রবল উন্নত সভ্য জাতি ও দুর্বল অনুন্নত জাতি পরস্পরের সংস্পর্শে আসে তখন এই শেষোক্ত জাতি নিজের সত্তা হারাইয়া একেবারে প্রথমোক্ত জাতির মধ্যে মিশিয়া যায় (রমেশচন্দ্র, ১৩৮০ : ১৮)।

রমেশবাবুর ভাষা এইখানে খেয়াল করা দরকার। তার মতে বাংলাদেশে আর্যরা ‘উপনিবেশ’ বানাইছিল। যদিও উপনিবেশ ধারনাটা আধুনিক কালের এবং অর্থেও ভিন্ন। শুধু আধুনিক কালেই উপনিবেশ শাসন পদ্ধতি চালানো সম্ভব। তিনি বলতেছেন, আর্যরা ছিল সভ্য উন্নত প্রবল, স্থানীয়রা দুর্বল ও অনুন্নত। কিন্তু গ্রীক লেখকদের লেখা থাইকা আমরা জানছি উল্টাটা। বঙ্গ জাতি প্রবল ছিল বইলা পশ্চিমের কেউ এই অঞ্চলে হামলা করতো না। রমেশবাবু এইখানে সেইটা উল্টায়া দিচ্ছেন।

বখতিয়ার খিলজীর উত্তরবঙ্গ বিজয় এবং মুসলিম শাসন কায়েমের বিষয়েও সন্দেহমূলক কথাবার্তা বলছেন রমেশবাবু। ১২০৪ সালে বখতিয়ার খিলজী নদীয়া দখল করেন। পরে লখনৌতি এবং এই দুই এলাকার আশপাশের অঞ্চলও মুসলমানদের দখলে আসে। মুসলমানদের রাজধানী হয় দেবকোট। বিজিত এসব অঞ্চল শাসনের দায়িত্ব দেয়া হয় তার সঙ্গী আমিরদের। এইটা প্রতিষ্ঠিত ইতিহাস। তবকাত-ই-নাসিরী গ্রন্থের লেখক মিনহাজের মাধ্যমে পাওয়া প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ ছাড়াও অন্যান বই থাইকা আমরা কিছু কিছু তথ্য পাই। বাংলাদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ) গ্রন্থের ‘বাংলায় মুসলিম অধিকার প্রতিষ্ঠা’ নামের প্রথম অধ্যায়ে সুখময় মুখোপাধ্যায় লেখছেন যে, ১২৫৫ সালে মুঘিসুন্দিন উজবেক যে মুদ্রা তৈয়ার করেন সেইসব মুদ্রায় লেখা আছে যে, সেইগুলি ‘নদীয়া ও অর্জবদন’ রাজ্যের খাজনার টাকায় বানানো হইছিল, অথচ অনেক ইতিহাস লেখক সেইগুলারে নদীয়া বিজয়ের স্মারক মুদ্রা মনে করছেন (রমেশচন্দ্র, ১৩৮০: ১২)।

সুখময় মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশিত এই ভুলটাই করছেন রমেশবাবু অথবা ইচ্ছা কইরাই মুদ্রাগুলার ভুল ব্যাখ্যা দিচ্ছেন। রমেশচন্দ্র মজুমদার এই মুদ্রাগুলারে বানাইছেন ১২৫৫ সালে মুঘিসুন্দিন কর্তৃক নদীয়া বিজয়ের স্মারক মুদ্রা। তারপর এই বিকৃত তথ্যের বরাত দিয়া লেখছেন:

১২৫৫ অন্দে মুঘিসুন্দিন উজবেক নদীয়া জয়ের চিহ্নকৃত যে মুদ্রা প্রচলিত করেন, তাহা হইতে অনুমিত হয়, ঐ তারিখের পূর্বে নদীয়ায় তুকী শাসন স্থায়ীভাবে

প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং নদীয়া কিছুদিন বখতিয়ারের অধিকারে থাকিলেও ইহা বে আবার সেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করাই সঙ্গত। কবি শরণ লিখিয়াছেন যে, লক্ষণসেন এক স্মেচ্ছ রাজাকে যুদ্ধে পরাভৃত করিয়াছিলেন। ইহা হইতে অনুমিত হয় লক্ষণসেন মুসলমানদিগের অগ্রগতিতে বাধা দিতে সমর্থ হইয়াছিল। (রমেশচন্দ্র, ১৩৮০ : ১১৮)।

এইরকম আরো ভুল তথ্য এবং প্রচলিত তথ্যের নানা রকম তাফসির দিয়া রমেশবাবু প্রমান করতে চাইছেন যে সেন বংশ অন্তত ১২৫০ সাল পর্যন্ত পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে স্বাধীন রাজা হিসাবে শাসন করেন। যদিও তার এ দাবীর কোন প্রামাণ্য ভিত্তি নাই। অথচ তবকাত ই নাসিরীতে আলী মর্দানের পরবর্তী শাসক গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ শাহ সম্পর্কে বলা হইছে, “লাখনৌতি রাজ্যের পার্শ্ববর্তী সমুদয় অঞ্চল, যথা, জাজনগর, বঙ্গরাজ্য, (কামরূদ), তিরহুত রাজ্যসমূহ তাঁকে কর প্রেরণ করত” (রমেশচন্দ্র, ১৩৮০ : ৬০-৬১)। লামা তারানাথের ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বইয়েও তুর্কি শাসকের অধীনে সামন্ত শাসক হিসাবে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে সেনদের শাসনের কথা বলা হইছে। গিয়াসউদ্দিন ইউয়জ ১২২৬-২৭ সালে নিহত হন। তাই ধইরা নিতে হবে এর আগেই পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গ লখনৌতির মুসলমান শাসকদেরকে কর দিতে শুরু করে। কাজেই, ১২৫০ সালে পূর্ব ও দক্ষিণবঙ্গে সেনদের স্বাধীন রাজত্ব রমেশবাবুর ইচ্ছাকৃত কাল্পনিক দাবী ছাড়া আর কিছুই না, যার পেছনে সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব কাজ করে থাকতে পারে। এর আরো কয়েকটা প্রমান পাওয়া যায়।

ভঙ্গি, প্রেম ও সমর্পনের মধ্য দিয়া ঈশ্বরের কাছ পাওয়ার বিনয়ী ও অহিংস ধর্মভাবনার গুরু হিসাবে চৈতন্যের জানে বাঙালি। সেই চৈতন্যের চরিত্রেও উৎ বীরভাব লাগায়া দেয়ার চেষ্টা করছেন রমেশবাবু। তিনি বলতেছেন নদীয়ার কাজী নগরে ঘুইরা ঘুইরা কীর্তন গাইতে নিষেধ করলে শ্রীচৈতন্য নাকি কাজীর বাড়িতে হামলা কইরা কাজীর মাথা কাইটা আনার আদেশ দিছিলেন। চৈতন্যভাগবতে আছে:

ক্রোধে বলে প্রভু ‘আরে কাজী বেটা কোথা।

ঝাট আন ধরিয়া কাটিয়া ফেলোঁ মাথা॥

প্রাণ লয়া কোথা কাজী গেল দিয়া দ্বার।

ঘর ভাঙ্গ ভাঙ্গ’ প্রভু বলে বার বার॥ (রমেশচন্দ্র, ১৩৮০ : ২৬২)

এই কথা শুইনা চৈতন্যভক্তরাঃ

ভাঙ্গিলে যত সব বাহিরের ঘর।

প্রভু বলে ‘অগ্নি দেহ বাড়ির ভিতর॥

পুড়িয়া মরুক সব গণের সহিতে।

সব বাড়ি বেড়ি অগ্নি দেহ চারি ভিতে॥ (রমেশচন্দ্র, ১৩৮০ : ২৬২)

চৈতন্য ভাগবতের এই কঠটা লাইনে চৈতন্যের জঙ্গী মারমুখি ভাব ফুইটা উঠছে। অনেকে মনে করেন শ্রীচৈতন্যের ধর্মভাবনা ও সারা জীবনের কর্মকাণ্ডের সাথে এই ছবি যায় না। কিন্তু রমেশচন্দ্র বার বার এই কথার উপরই জোর দিতে চাইছেন যে, শ্রীচৈতন্য সত্ত্ব সত্ত্ব এইরকম নির্দেশ দিছিলেন, অন্য জীবনীকাররা ভয়ে সেইসব কথা লেখে নাই। কিন্তু এর ফলে চৈতন্যের চিরন্তন অহিংস ভক্তিবাদী ভাবমূর্তি যে ক্ষুণ্ণ হয় সেই ঝুঁকিটাও নিতে কসুর করেন নাই রমেশচন্দ্র। কেন? কারণ একটাই তিনি চৈতন্যের অহিংস ভাবমূর্তির চেয়ে উগ্র বীরভাবটারে বেশি জরুরি মনে করেন। তাই কাজীর ঘরবাড়িতে আগুন দেয়ার এবং কাজীর মাথা কাইটা ফেলার আদেশ চৈতন্যই দিছিলেন প্রমাণ কইরা বলতে চাইছেন:

গত তিনি শতাধিক বৎসর বাংলার বৈষ্ণবগণ চৈতন্যের কেবল একটি মূর্তি ধ্যান ও ধারণা করিয়াছেন— কৃষ্ণনাম জপিতে জপিতে ভাবাবেশে সংজ্ঞাহীন ভুলুষ্ঠিত ধূলিধূসরিত দেহ। কিন্তু তাহার যে দৃঢ় বলিষ্ঠ পুত চরিত্র ভক্তের সামান্য নীতিভূষ্ঠিতাও ক্ষমা করে নাই এবং যিনি দুরাচারী যবনকে শান্তি দিবার জন্য সদলবলে অঞ্চল হইয়া বলিয়াছিলেন “নির্যবন কঁরো আজি সকল ভুবন।”— বাঙালি তাহা মনে রাখে নাই (রমেশচন্দ্র, ১৩৮০: ২৬৩)।

বেশ! এইখানে আইসা রমেশবাবু ভক্তি ও প্রেমবাদী চৈতন্যের শেষ পর্যন্ত একুশ শতকের ভারতের জঙ্গী হিন্দুর চরিত্র বানায় ছাড়েন, যা রমেশচন্দ্রের অসাম্প্রদায়িক ঐতিহাসিকের ভাবমূর্তিরে যেমন আর অটুট রাখে না তেমনি মুসলিম-বিদ্বেষের রোখটাও উদাম কইর দেখায়। এইখানে তার ভাষাও লক্ষ্য করার মত। নদীয়ার মুসলমানদেরকে তিনি বলতেছেন ‘দূরাচারী যবন’। তার মুসলিম বিদ্বেষ এতটাই তীব্র যে, চৈতন্যের ভক্তিবাদী-অহিংস ভাবমূর্তির উপ্রে বর্তমান ভারতের জঙ্গী হিন্দুর ভাবমূর্তি চাপায়া অহিংস চৈতন্যের মধ্য দিয়া হিন্দুর বীরত্বের প্রমান দিতে চায়। পাশাপাশি, যেন তাল মিলানোর জন্যই, ‘নিম্ন-শ্রেণির হিন্দু থাইকা মুসলমান হওয়ার’ হাইপোথিসিসের পক্ষেও দাড়ান তিনি:

হিন্দু সমাজে নিম্ন-শ্রেণির লোকেরা নানা অসুবিধা ও অপমান সহ্য করিত। কিন্তু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিলে যোগ্যতা অনুসারে রাজ্য ও সমাজে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পক্ষেও তাহাদের কোন বাধা ছিল না। বখতিয়ার খিলজীর একজন মেচজাতীয় অনুচর গৌড়ের সন্দাট হইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া যে দলে দলে নিম্নশ্রেণির হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত ইহাতে আশ্চর্য বোধ করিবার কিছু নাই। (রমেশচন্দ্র মজুমদার, ১৩৮০: ২৩২)।

গোটা প্রবক্ষে আরো কয়েক জায়গায় একই কথা বলেন রমেশচন্দ্র। অর্থাৎ সেই বেভারলির আদমশুমারিতে বাংলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠের ব্যাখ্যা- বক্ষিমচন্দ্র, রাজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত হয়া ইতিহাসের সত্ত্ব হিসাবে হাজির হইছে রমেশচন্দ্র মজুমদারেও।

সাধারণ পাঠক সমাজে অনেক কথা চালু থাকে, অনেক ভাবমূর্তি তৈয়ার হয়, যা বাস্তবে হয়ত সত্য না। আমরা রমেশচন্দ্র মজুমদারের অসাম্প্রদায়িক বন্তনিষ্ঠ ইতিহাসকার-এর ভাবমূর্তির আড়ালে সাম্প্রদায়িক আবেগের উঠানামা দেখলাম। দেখলাম যে তাকে কেউ কেউ অসাম্প্রদায়িক মনে করলেও তিনি মোটও অসাম্প্রদায়িক না, এবং তাঁর মুসলিম-বিদ্বেষ সব সময় গোপনও রাখেন নাই।

হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস লেখকদের নেতৃত্বে মধ্যযুগের বাংলার মুসলমান শাসকদের বদনাম এবং নিচু জাতের হিন্দু থাইকা মুসলমান হওয়ার অনুমান নির্ভর তত্ত্ব প্রচারের প্রতিক্রিয়া হিসাবে কয়েকজন মুসলমান লেখক বাংলায় মুসলমানদের ইতিহাস নিয়া বইপত্র লেখছেন। তাদের মধ্যে ফজলে রাবির *The Origin of The Musalmans in Bengal* (১৮৯৫) এবং ডক্টর আবদুর রহিমের *Social and Cultural History of Bengal* (১৯৬৩, ৬৭) বেশ আলোচিত। এইজন্য এই দুইটা বই নিয়া একটু কথা বলা দরকার।

১৮৭২ সালের আদম শুমারিতে বাংলায় মুসলমান ধর্মের মানুষ বেশি পাওয়ার পরে বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, এরা যখন নিচু জাতের হিন্দু থাইকা এইদেশের মুসলমান আসার তত্ত্ব প্রচার করতে থাকেন তখন প্রথম প্রতিবাদ করেন মুর্শিদাবাদের নবাবের দেওয়ান খন্দকার ফজলে রাবি। *The Origin of The Musalmans in Bengal* বইয়ে ফজলে রাবি সাহেব প্রচুর তথ্য উপাত্ত দিছেন। বখতিয়ার খিলজীর বাংলা দখলাভিযানের পরে পাঁচশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে ভারত থাইকা বহু সম্মানিত মুসলিম পরিবার বাংলায় আসছে। তাদের খবর দিছেন ফজলে রাবি। ব্যবসা করার জন্য যেসব মুসলমান আসছিল তাদের কথাও উল্লেখ করছেন। এ ছাড়া আসছিল আরব-ইরান-তুর্কি-মধ্যএশীয় সাধারণ সৈনিক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী। সমস্যা হইল এইসব তথ্যের ভিত্তিতে যে তাফসির তিনি হাজির করছেন সেইটা যুক্তির মধ্যে পড়ে না। তিনি বলতে চাইছেন বহিরাগত মুসলমানরাই এইদেশের মুসলমান সমাজের মূল অংশ গইড়া তুলছে। কাজেই নিচু জাতের মুসলমান হওয়ার তত্ত্ব ঠিক না। আমরা সাধারণ যুক্তি দিয়াও বুঝতে পারি ফজলে রাবির এই ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্য না। যতই আরবীয়-ইরানীয়-তুর্কি যোদ্ধা প্রশাসক সুফি দরবেশ এইদেশে আইসা থাকুক সেই সংখ্যাটা মূল জনসংখ্যার তুলনায় খুব বেশি হওয়ার কথা না। হয়ত এইসব কারনে ফজলে রাবির মতামত দাঢ়াইতে পারে নাই।

একই কথা বলা যায় এম এ রহিমের বইটা সম্পর্কে। তিনিও প্রচুর তথ্য উপাত্ত দিছেন মধ্যযুগের বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে। মুসলিম শাসনামলের বিভিন্ন পর্যায়ে তুর্কি-খলজি-পাঠান-মুগল মিলায়া প্রচুর সাধারণ সৈনিক প্রশাসক

কর্মকর্তা-কর্মচারী আসছে বাংলাদেশে। বহু পীর-দরবেশও আসছেন প্রুণ
শিষ্যসাগরেদসহ। এ ছাড়া দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে কেউ কেউ যখন ফেনো কেনে
বহিরাগত মুসলিম গোষ্ঠীর উপ্রে খাপ্পা হয়ে উঠছে তখন তারা দেশান্তরী হজা বাংলার
উদার শাসকদের আশ্রয় নিছে। ডক্টর রহিম এদের সম্পর্কেও আমদেরকে তথ্য
দিছেন। ব্যতিয়ার খিলজীর থাইকা ১৭৫৭ সাল পর্যন্ত যত মুসলমান এইবালে আসছে
তার একটা হিসাব দাঢ় করানোর চেষ্টা করছেন তিনি। এই পর্যন্ত তার কাজ
মূল্যবান। কিন্তু এইসব তথ্যের তাফসির করার সময় তিনিও ফজলে রাক্ষিক মত এই
ফরসালা দিছেন যে বহিরাগত মুসলমানরা বাঙালি মুসলিম জনগোষ্ঠীর বড় অংশ।
কাজেই, নিচু জাতের হিন্দু থাইকা মুসলমান হওয়ার তত্ত্ব ঠিক না। আমরা এম এ
রহিমের এই তাফসিরও নিতে পারি না, একই যুক্তিতে। বহিরাগত মুসলমান বত
বেশি সংখ্যায়ই আইসা থাকুক সেইটা কোন মতেই এইখানকার জনগোষ্ঠীর বড় অংশ
হয়া উঠার মত বড় না।

সমস্যাটা এই দুইজনের চিন্তার রোধে। নিচু জাতের হিন্দু থাইকা সব মুসলমান
হওয়ার বয়ানে তাদের মধ্যে যে প্রতিক্রিয়া হয় সেইটা তাদেরকে তেইলা দের
আত্মরক্ষামূলক অবস্থানে। ফলে তারা বুঝতেই পারেন নাই যে হিন্দুত্ববাদীদের অই
তত্ত্বাই দাঢ়ায়া আছে ভুলভাল আনুমানিক কথাবার্তার উপর। সে কারনে বকিম-
রাজকুক্ষ গংদের হাইপোথিসিসের অনন্তেত্বাসিকতা ও অসারত্বের দিকটা তাদের
চোখ এড়ায়া গেছে, সেইটারে ভিত্তির দিক থাইকা বাতিলের চেষ্টা করেন নাই। বরং
প্রমানের চেষ্টা করছেন বাঙালি মুসলমানের শরীরে বহিরাগত আরব রক্তের প্রাধান্য।
তাই হিন্দুত্ববাদী ইতিহাসের সামনে খাড়াইতে পারে নাই ফলে ফজলে রাক্ষি বা এম
এ রহিমের মতামত। মুসলমানদের মধ্যে এই বিষয়ে আরো কেউ কেউ লেখেছেন।
তারা সবাই ফজলে রাক্ষিক দেখানো পথে হাঁটার কারনে কেউই সত্যের কাছাকাছি
পৌছাইতে পারে নাই বইলা সেইগুলা অনালোচিতই রয়া গেছে।

পাঁচ

এই পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ঐতিহাসিকের লেখাজোকা নিয়া আলাপ করলাম।
এরা এই দেশের ইতিহাস চর্চার সিলসিলায় আদি পীর-মুর্শিদের জায়গায় বইসা
আছেন। অথচ খুটায়া পড়লে দেখা যায় এদের প্রত্যেকের লেখাতে উনিশ শতকের
শেষের আধাকালে গজায়া উঠা হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস প্রকল্পের মূল চাইরটা খৌক বেশ

পোক হয়া বইসা আছে, যার সংগঠিত ও খোলামেলা বিনোদন পাই আমরা বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাস প্রকল্পে। এইখানে সেইগুলো আনেকবার উল্লেখ করা যাইতে পারে: (১) পলাশির ঘড়য়ের মাধ্যমে সিরাজের পতনরে মুসলমানের জাতিগত প্রাজ্য এবং বৃটিশের বিজয়ের হিন্দুর মুক্তি হিসাবে দেখা। ইউরোপিয়দের লেখায় সংকৃত ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে ব্যাপক প্রশংসা, আর্য জাতিগত ধারনার বিকাশ, ভারতীয় ‘আর্যদের সাথে ইউরোপের আর্য গোষ্ঠীর আত্মায়তার হাইপোথিসিস। এবং এইসব চিন্তভাবনার প্রভাবে সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ্যবাদীদের নিজেদেরকে আর্য-হিন্দু হিসাবে শ্রেষ্ঠ মানুষ ভাবতে শুরু করা। (২) এ ভাবনার সুবিধার্থে একীভূত আর্য-হিন্দু ভারত এবং সেখানে একটি আদর্শ, সুগঠিত, জ্ঞানসাধক হিন্দু সমাজের কল্পনা এবং যেহেতু ইতিহাসে তার অস্তিত্ব নাই তাই পুরান, ধর্মীয় লোককাহিনী, কিংবদন্তী ইত্যাদির বিবরনরে ইতিহাস হিসাবে হাজির করা (৩) একই উদ্দেশ্যে ঐতিহাসিক মুসলিম চরিত্রগুলারে খারাপ মানুষ হিসাবে দেখানো (৪) মুসলমান আম জনতার মনে হীনমন্যতা তৈরির মাধ্যমে মানসিক শক্তি ধ্বংস করার জন্য ‘নিম্নশ্রেণির হিন্দু থাইকা মুসলমান হওয়ার’ আনুমানিক বয়ান তৈরি ও প্রচার।

হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস প্রকল্পের মুখ্যপাত্র বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ইতিহাসভাবনার প্রভাবে বাঙালির ইতিহাস চর্চায় এই চাইরটা বৌক যেসব আনুমানিক, কাল্পনিক, অযৌক্তিক তাফসিরি বয়ানের জন্য দিছে এখন সেইগুলার অন-ঐতিহাসিকতার ব্যাপারে আলাপ করব। প্রথমে একীভূত প্রাচীন আর্য-হিন্দু ভারত এবং আদর্শ, জ্ঞান-সন্ধানী হিন্দু সমাজের আন্দাজি বয়ান প্রসঙ্গ।

উনিশ শতকে আতাগৌরবের আকাঞ্চ্ছায় জাগ্রত হিন্দুত্ববাদী লেখক-বুদ্ধিজীবীরা যেভাবে আদর্শ হিন্দু ধর্ম ও একীভূত হিন্দু ভারতের ধারণা লালন করেন প্রাচীন ভারতে কিন্তু সেইরকম কোনো ধর্মীয় বা রাষ্ট্রীয় অবস্থা আছিলো না। ভারত নামে একীভূত কোনো রাজ্যের ধারনাও দানা বাধে নাই তখন। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমনের আগের কোনো তথ্য আমাদের হাতে নাই। আলেকজান্ডারের সময় এইখানে অনেকগুলো ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য আছিল।

আলেকজান্ডার চইলা যাওনের পরে মৌর্য রাজ্য গইড়া উঠে, যেটা প্রথমবারের মতো বর্তমান ভারতের বেশিরভাগ রাজ্যের যুক্তে হারায়া করের আওতায় আনতে পারছিল, কেবল একেবারে দক্ষিণের দিকটা ছাড়া। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে বর্তমান রাষ্ট্রগুলার সরকার ব্যবস্থার অধীন দেশ আর খ্রিস্টের জন্মের আগের ভারতের রাজ্যব্যবস্থা একরকম না। তখন ছোট রাজ্যগুলা শক্তিশালী রাজ্যের বড় মাইনা নিয়মিত কিছু খাজনাটাজনা দিত, উপহার পাঠাইত। কিন্তু নিজের এলাকা চলত নিজের নিয়মেই। ছোট ছোট রাজ্যের সব এলাকা নিয়া একসাথে একটা বড় রাজ্যের

নাম প্রচার করা হইত, শক্তিশালী শাসকের গুরুকীর্তন গাওয়া হইত, তাকে মান্য করা হইত। হয়ত বাইরের শক্তির সাথে যুদ্ধ লাগলে ছোট রাজ্যগুলা তাদের সেনাবাহিনী নিয়া মূলরাজ্যের সেনাবাহিনীর সাথে যোগ দিত। ছোট ছোট রাজ্যগুলার মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি, ধর্মচর্চা, শিল্পচর্চা চলতো যার যার মত, তাতে ব্যাঘাত ঘটতো না।

মৌর্য সম্রাজ্যের কেন্দ্র আছিল পাটনা। এরপরের কুষান রাজ্যের রাজধানী পেশোয়ারে আর মথুরায়। শুঙ্গ সম্রাজ্যের আস্তানা আছিল মগধে। এইগুলার কোনটাই গোটা ভারত না। এইসব বড় বড় রাজ্যের কেন্দ্র ভিন্ন হওয়াটাও সেইটাই প্রমাণ করে। একক ভারত সম্রাজ্য থাকলে তার কেন্দ্রও থাকত কিছুটা নির্ধারিত। তো, সেই কালের ছোট ছোট রাজ্যগুলার লোকেরা জীবন যাপন করতো নিজেদের রাজ্যের প্রথা অনুযায়ী। তাদের ধর্মবোধও ছিল নিজেদের মত। সাধারণত এক এক রাজ্য এক একজন প্রধান দেবতা ছিলেন। মৌর্যরা প্রথম দিকে স্থানীয় ধর্মের চর্চা করত যেটারে পরে হিন্দু ধর্ম সনাতন ধর্ম এইসব নাম দেয়া হয়। কুষানরা বৌদ্ধ ধর্ম ও পারসিক ধর্মের কিছু আচার-বিশ্বাস চর্চা করতো, আবার শিবেরেও আল্লাহ মানত। শুঙ্গদের পুজিত দেবতা হিসাবে পাওয়া গেছে কুবেরের মূর্তি, অনচিনা দেবীমূর্তি। পুষ্যমিত্র নাকি রাজসূয়া যজ্ঞ এবং অশুমেধ যজ্ঞ করছিলেন। আবার শুঙ্গদের আমলেই কিছু বিখ্যাত বৌদ্ধ স্তুপ বানানো হয়। যেমন ভরহৃত স্তুপ আর তার চাইরদিকের জাতকের কাহিনীর ভাস্কর্যগুলা তৈয়ার হয় তাদের সময়েই। ভরহৃত স্তুপ নির্মানের খরচ যারা দেন তাদের একজন হলেন রানী চম্পাদেবি, যিনি আবার বিষ্ণুর পুজারী। সাঁচীর স্তুপের অনেক বাড়তি কাজ হয় শুঙ্গ আমলে। মোট কথা অই যুগে ভারতে বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচর্চার ভিন্নতা ছিল। কেবল বৌদ্ধ ধর্মের সৃষ্টি হয় নির্দিষ্ট দর্শন ও বিশ্বাস ও নির্দেশনার ভিত্তিতে। হিন্দু ধর্মের তেমন একীভুত কোনো রূপ ছিলো না, অঞ্চলভিত্তিক একেক রূপ আছিল, যেগুলার সর্বপ্রানবাদী দিকটাও বিবেচনা করা দরকার।

এইসব আঞ্চলিক চর্চা ও বিশ্বাসের ভিন্নতাগুলি দীর্ঘদিন কাছাকাছি চলার বহু পরে বিভিন্ন ধাপে হিন্দু ধর্মের অংশ হয়া উঠে। এইজন্যই বলা হয় হিন্দু ধর্ম হইল অনেকগুলা বিশ্বাস ও দর্শনের মেল। দেবতাদের ক্ষমতা ভাগাভাগি ও মাত্রা বিবেচনা করলে দেখা যায় কোন একজোড়া দেবতার মধ্যে এক দেবতা একদিক দিয়া অন্য দেবতার চেয়ে বেশি ক্ষমতাবান, আবার আরেক দিক দিয়া তার কাছে অসহায়। এইটা একটা প্রমাণ যে, এইসব দেবতাদের একেকজন একেক অঞ্চল বা গোত্রের প্রধান দেবতা আছিল, তারার ধর্মাচারের রূপও আছিল ভিন্ন। পরে এইসব ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চল বা গোত্রগুলি একসাথে হওয়ার সময় ধর্মীয় আচারের গুরুত্ব ও দেবতাদের ক্ষমতার ভাগাভাগিতে পুরাপুরি সামঞ্জস্য আনা সম্ভব হয় নাই। কিছু অসঙ্গতি থাইকা

গেছে। মূলত গুণ্ঠ আমলে হিন্দু ধর্ম কিছুটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায়। সবচেয়ে বেশি সংগঠিত হয় সেন আমলে। সেনদের সংস্কারের পথ ধইরা পরবর্তী শতকগুলাতে আরো সুশৃঙ্খল ও পদ্ধতিভিত্তিক হয়।

তবে হিন্দু-ধর্মকেন্দ্রিক আত্মগরিমার জন্য দরকার আছিল এমন একটা বিশ্বাস যে, ভারতে প্রাচীন কাল থাইকা হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু ধর্মীয় মানব সমাজ চইলা আসছে যার মাতৰারির খোদায়ী অধিকার ব্রাহ্মণদের হাতে। সেইটা প্রমাণের জন্য ইতিহাস ঘাঁইটা যখন কিছু পাওয়া যায় না তখন তারা হাত বাড়ায় পুরানকাহিনী, ধর্মীয় লোকসাহিত্য ইত্যাদির দিকে। তাদের আশ্রয় হয় উঠে রামায়ন মহাভারতসহ সব পুরান কাহিনী। সেইখানে অনেক পৌরাণিক রাজা সেনাপতি মহাবীরদের কথা ছড়ায় আছে, যদিও সেইসব বয়ানের বর্ণনামত কোন রক্ত মাংসের মানুষ ছিলো কি না জানা নাই। তবু সেইগুলারেই মুসলিম রাজা-বাদশার ভারত জয়ের কাহিনীর বিপরীতে দাঁড় করায়া দেয় তারা। সামগ্রিকভাবে তাদের অহংকারের প্রতীকে পরিণত হয় সংস্কৃত ভাষা, আর্য জাতিত্ব, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু পুরানাদির চরিত্র। এইগুলা ধীরে ধীরে তাদের ইতিহাস বোধের ভিত্তে চুইকা যায়। এই কথাটা ভারতের ইতিহাসবিদ রমিলা থাপারও স্বীকার গেছেন (রমিলা থাপার, ২০২১)। বক্ষিমচন্দ্র থাইকা শুরু কইরা পরবর্তী অনেকের লেখায় তার সাক্ষ্যই আমরা দেখলাম। প্রাচীন ভারতে একীভূত আর্য-হিন্দু রাজ্য এবং তার মধ্যে আদর্শ হিন্দু সমাজের কল্ননাপ্রসূত বিশ্বাস রঙচোরা ধারণা হিসাবে আমাদের প্রচলিত ইতিহাসের অংশ হয়া আছে।

আর্যত্ব নামের যে বিষয়টা নিয়া এত কিছু সেইটা কিভাবে আমাদের চিন্তায় প্রথম গজাইল আর এই পর্যন্ত আসল তা দেখা যাক। জেন্দ আবেন্টার ভেনদিদা বইয়ে লেখা আছে পারসিকদের দৈশ্বর আল্লামাজদা জুরথুস্কে বলতেছেন যে, তিনি যে-ষোলটা অঞ্চল বানাইছেন তার মধ্যে প্রথম তৈয়ার করছেন ‘এইরিয়ানেম বায়জা’ নামের দেশটা। কোন জায়গার নাম ছিল ‘এইরিয়ানেম বায়জা’ সেইটা আর এখন বুঝার উপায় নাই। ইউরোপীয় আর্যত্ববাদীরা দাবি করেন এই ‘এইরিয়ানেম’ জায়গাটাই আছিল প্রত্ন-ইন্দো-ইউরোপীয়দের আদি বাসস্থান।

প্রাচীন ভারতে ‘আর্য’ কথাটা ব্যবহার হইত ভাল গুনের মানুষ বুঝাইতে। ইউরোপে সর্বপ্রথম ফরাশি ভারতবিদ অঁকাচিলু জুপেঁরো ভেনদিদার এইরিনিয়াম শব্দটা থাইকা ‘এরিয়েন’ কথাটা ব্যবহার করেন জায়গার নাম বুঝাইতে। কিন্তু ১৭৯৪ সালে উইলিয়াম জোনসের লেখায় ‘আর্য’ শব্দের অর্থ হয় ‘মহত মানুষ’। উনিশ শতকের পাঁতিরা কিছুকাল পরে আদি ইন্দো-ইউরোপিয়দের ভাষাকে ‘এরিয়ান’ নামে উল্লেখ করতে থাকে। এরপরে দিন দিন এর সাথে নানা অর্থ যোগ হয়। বিশেষ কইরা ফ্রেডরিশ শ্রেগেল এবং ম্যান্মুলারের লেখালেখির প্রভাবে ‘আর্য’ পরিচিতি পায়

ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষাভাষী এক আলাদা মানবগোষ্ঠীর নাম হিসাবে; বিশ্বাস করা হয় আর্যরা ছিল মানুষ হিসাবে সেরা ।

এই ধারনাটারে আরো ফুলায়া ফাপায়া বিরাট আকার দেন ম্যাক্সমুলার । এইরকম একটা হাইপোথিসিস দাঁড় করানো হয় যে, যারা অতি প্রাচীনকালে ককেশীয় পার্বত্য এলাকায় বাস করত এবং ইন্দো-ইউরোপিয় ভাষায় কথা বলত তারা হইল আর্য । ধইরা নেয়া হয় এই মানুষগুলো কোনো এক সময় দুই ভাগ হয়া এক ভাগ ইউরোপে বসতি করে । অন্য দলটা আবার দুইভাগ হয়া এক ভাগ ইরানে যায়, বাকিরা আসে ভারতে । ভারতে আইসা কালো বর্ণের দাসদের পদানত কইরা ভারতের সভ্যতা গইড়া তুলে । আর্যদের একটা দৈহিক বিবরণও চালু হয়া যায়: লম্বা, একহারা, শক্তিশালী, ফর্সা, খাড়া নাক, ডিম্বাকৃতি মুখাবয়ব, ইত্যাদি । আমরা এইখানে দেখাইতে চাই ব্রাহ্মন্যবাদীরা নিজেদেরকে যে বিশুদ্ধ আর্য রক্তের মানুষ বইলা দাবি করেন সেই দাবি কতটা অযৌক্তিক, দুনিয়াছাড়া । আদতে ‘বিশুদ্ধ আর্য’ ধারনাটাই ভুল, আত্মগরবে অঙ্গ ভারতীয় হিন্দুত্ববাদী আর জর্মন উৎ জাতীয়তাবাদীদের বানোয়াট একটা কথা মাত্র ।

ম্যাক্সমুলার মধ্যএশিয়া থাইকা তথাকথিত আর্যদের ইউরোপে ইরানে এবং ভারতে দেশান্তরের যে কথা বলছেন তা অনেকটাই সত্যি বইলা প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে ভাষার চিন্মুক ধইরা এবং সাম্প্রতিক কালের জিনতত্ত্বের মারফত । কিন্তু সেইসঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চল থাইকা আরো অনেক মানবগোষ্ঠীর ভারতে দেশান্তরের কাহিনীও পুনর্গঠিত হইতেছে । ঘাইটসন্তর হাজার বছর আগে আফ্রিকা থাইকা একদল মানুষ আরব অঞ্চল ও ভারতে আসে । দশপন্থ হাজার বছর পরে আরো একদল মানুষ আফ্রিকা থাইকা এইদিকে দেশান্তরী হয় । এইভাবে মানুষ ছড়ায় পড়ে আরব অঞ্চল, ইউরোপ ও মধ্য এশিয়ায় । এরপর থাইকা চল্লিশপঞ্চাশ হাজার বছর ধইরা এরাই নানা কারণে বহুবার এক অঞ্চল থাইকা আরেক অঞ্চলে দেশান্তরী হয় । মধ্য এশিয়ার তথাকথিত আর্যভাষীদের ইরান ও ভারতে আসার ঘটনা ঐসব দেশান্তরের একট ছোট পর্ব মাত্র ।

কিভাবে এই দেশান্তর ঘটছে সেই আলাপটাও জানা দরকার । মধ্য এশিয়ার তথাকথিত সকল ‘আর্য’ একরাইতে শলা কইরা এক সাথে রওয়ানা হয়া উত্তর ভারতে হাজির হয় নাই । দেশান্তর হইছে ছোট ছোট দলে এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে । স্বভাবিক চিন্মুক থাইকাও বলা যায় খুব মিলমিশের মধ্যে যারা একসাথে বসবাস করতো, শক্রর বা প্রকৃতির হামলা যারা একসাথে মোকাবিলা করতো তারাই একসাথে দেশান্তরী হইত, ভালো জায়গার খুঁজে বা শক্রর হাত থাইকা বাঁচার জন্য । মধ্য এশিয়া ছাইড়া ভারত পর্যন্ত আসতেও বহু যুগ কয়েক প্রজন্য পার হয়া গেছে, কিছুটা বদলায়া গেছে তাদের ভাষা, সংস্কৃতি, আচরণ । এইভাবে একেক সময় একেকটা দল হাজার হাজার

মাইল পার হয়া উত্তর ভারতে হাজির হওয়ার পর স্থানীয়দের সাথে মারামারি কাটাকাটি হইছে, মিলমিশও হইছে, মিইশা গেছে দুই দলের রক্ত ভাষা ও চিন্তা। একে অপরের কিছু কিছু বিষয় মাইনা নিয়া একটা নতুন রক্তধারা, ভাষা ও ভাবজগতের সৃষ্টি করছে। জেনেটিকসের ফয়সালাও সেই কথার পক্ষে।

গবেষকরা প্রমাণ পাইছেন প্রায় চাইর হাজার বছর আগে ভারতের মানুষদের মধ্যে কোনো মিশ্রন হয় নাই। এরপর শুরু হইছে বিভিন্ন রক্তের মিলামিশা। তখন এমন ব্যাপক মিশামিশি হয় যে, প্রতিটি অঞ্চল, উপজাতি, গোত্র এমনকি সবচেয়ে আলাদা দূরের এক কোনার বাসিন্দা উপজাতির প্রত্যেকটা মানুষও সেই মিশামিশির মধ্যে পড়ছে। (David Cameron, 2013) এর থেকে প্রমাণ হয় ইন্দো-ইরানীয়রা ভারতে দেশান্তরী হওয়ার পর ব্যাপক মিশ্রন হইছে। হয়ত শত শত বছর বা তার চেয়ে বেশি সময় ধইরা এ ঘটনা ঘটছে। এরপর মোটামুটি উনিশশ বছর আগে মানুষের মিশ্রন কইমা যায়। হয়ত সেই সময় থাইকা সমাজে ব্রাহ্মণবাদীদের জাতপাতের নিয়ম চালু হইতেছে, তাই কইমা গেছে মিশামিশার হার।

তাইলে কথা দাড়াইতেছে এই যে, যিনি বা যারা নিজেরে খাঁটি আর্য রক্তের মানুষ দাবি করতেছেন তিনিও বারোয়ারি রক্তের ফসল, যার সূচনা হইছে অতি প্রাচীনকালে। তারও প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে জিনবিজ্ঞানের বদৌলতে। ডিএনএ পরীক্ষা কইরা দেখা গেছে বাংলাদেশের মানুষের শরীরে গড় পড়তায় ৯ ধরণের ওয়াই ডিএনএ হ্যাপলোফ্রপ পাওয়া গেছে (Poznik GD et el. 2016: 593-599)। ভারতের ব্রাহ্মণদের শরীরে পাওয়া গেছে ১২টা ওয়াই ডিএনএ হ্যাপলোফ্রপ (Xhao Z, et el. 2009: 46-59)। অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের রক্ত ঠিক ঠিক বারোয়ারি রক্ত। যার অর্থ হইল ব্রাহ্মণদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশি মিশামিশি হইছে। সাধারণ বুদ্ধিতেও বুবা যায় ভারতে ঢোকার মুখের এলাকাগুলাতে মিশ্রন বেশি হওয়া কথা। এইটাও সত্য যে, মিশ্রন ছাড়া কোন মানুষ নাই। অর্থ বহুদিন ধইরা এমনভাবে প্রচার কইরা আসা হইতেছে ‘বাঙালি একটি মিশ্র জাতি’, যেন আর সব জাতের মানুষে মিশ্রন ঘটে নাই। যাইহোক, জেনেটিকসের সহায়তায় জানা সম্ভব হইছে ব্রাহ্মণরা সবচেয়ে মিশ্র রক্তের মানুষ। এমন অবস্থায় খাঁটি আর্য রক্ত বা খাঁটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ও সংস্কৃতির চিন্তাটাই বাতুলতা মাত্র।

কুড়ি শতকের প্রথম আধাকালে খাঁটি ‘আর্যত্বের’ গৌরবের কেন্দ্র কইরা অনেক রক্তারঙ্গি খুনাখুনি হইছে ইউরোপে। ভারতে আর্যত্বের ধারনা দরিদ্র ক্ষমতাহীনদের শোষন-নির্যাতনে ব্যবহৃত হয়া আসতেছে বহু শত বছর থাইকা। ভারতের হিন্দুত্ববাদী-ব্রাহ্মণবাদীদের অনুকরনে বাংলাদেশের এক শ্রেণির বোধবুদ্ধিহীন লেখক-শিল্পী আর্য পরিভাষাটারে বাঙালিত্বের বিপক্ষে উঁচা সম্মানের জায়গায় বসায় এর ব্যবহার এখনো জারি রাখছে। এইসব কারণে নৃ-বিজ্ঞান ও অন্যান্য জ্ঞানকান্ডের

আলোচনায় অনেকে ঘিন্নায় হোক বা সমালোচিত হওয়ার ভয়েই হোক মানবগোষ্ঠী
বুঝাইতে আর্য কথাটা আর ব্যবহার করেন না। তার বদলে ‘ইন্দো-ইরানীয়’
পরিভাষাটা চালু হইছে। এখন ঐ ভাষাভাষী মানবগোষ্ঠী অর্থে ‘আর্য’ ধারণাটা একটা
ভূল এবং ফ্যাসিস্ট ধারণা, পরিভাষাটা পতিত পরিভাষা। অথচ বাঙালির ইতিহাস
শুরুই হয় বাংলাদেশে বিশুদ্ধ ‘আর্য’ বসতি আর স্থানীয়দের উপর তথাকথিত
‘আর্যদের উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার গল্প দিয়া। সেই গল্পের প্রমাণ হিসাবে হাজির করা হয়
পুরানকাহিনী, ধর্মীয় লোককাহিনী ইত্যাদি অন-ইতিহাসিক উৎস।

দুনিয়ার প্রতিটি ধর্মের নিজস্ব পুরানকাহিনী আছে। সাধারণত প্রাচীন যুগের
মানুষের সমাজে অলৌকিক বিশ্বাস থাইকা মুখে মুখে পুরানকাহিনীগুলা সৃষ্টি হইছে।
কোনো গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বা বিশ্বাসের ব্যাখ্যা হিসাবে কোন এক যুগে হয়তো মূল
কাহিনীটা তৈয়ার হইছে। সেই সমাজের মানুষেরা বহুযুগ ধইয়া মূল কাহিনীটা বলতে
বলতে তার ডালপালা তৈয়ার হইছে, আরো রঙ লাগছে, কিছু কিছু জিনিষ বদলায়
গিয়া যুক্ত হইছে নতুন কিছু। অর্থাৎ পুরানকাহিনী হইল বহুযুগের মানুষের হাতে
গইড়া উঠা সম্পদ যার মধ্যে নানা কালের বিভিন্ন মানুষের সৃষ্টিশীলতার চিন্ময় আছে।
এইগুলাতে সময়ের কোন ঠিকঠিকানা নাই, ঘটনার বিবরনে বাস্তবতার সঙ্গতি নাই।
যেমন, একটা উপনিষদের নাম ‘আল্লোপনিষদ’, যেটাতে আল্লাহর কথা আছে। এইটা
শুরু সম্ভবত যোল শতকে লেখা। অথচ উপনিষদ নাকি আড়াই তিনি হাজার বছরের
আগের রচনা। এইগুলাতে সরাসরি ইতিহাসের উপাদান খোজা অর্থহীন। কিন্তু
আমাদের ইতিহাস চর্চায় এই কাজটাই করা হইছে। প্রাচীন ভারতে আদর্শ আর্য-হিন্দু
সমাজের কল্পনাটাই আসছে পুরানকাহিনী থাইকা।

এ যাবত আমরা দেখছি উনিশ ও বিশ শতকের আধাকাল পর্যন্ত বাঙালির
ইতিহাস চর্চায় পুরান ধর্মীয় লোকসাহিত্য ইত্যাদি থাইকা কি পরিমান কথাবার্তা
আইনা ইতিহাস বইলা চালায়া দেয়া হইছে, যার মূল উদ্দেশ্য হইল বাঙালি হিন্দুর
তাগদের প্রমান দেয়া। একীভূত প্রাচীন আর্য-হিন্দু ভারত ও সেইখানকার সুষ্ঠ,
আদর্শ, জ্ঞানসঞ্চানী হিন্দু সমাজের ধারনার পুরাটাই পুরানকাহিনী, ধর্মীয়
লোককাহিনী, কিংবদন্তী এইসব থাইকা নেয়া। অথচ এই জাতীয় বইয়ের লেখকরা
নিজেদেরকে বিজ্ঞানমনস্ক বইলা প্রচার করেন। বাঙালির সঠিক ইতিহাস লেখতে
হইলে পুরান ধর্মীয় লোককাহিনী প্রভৃতির উপর নির্ভর কইয়া লেখা এইসব ব্যান
পুরাপুরি বাদ দিতে হবে।

কোনো কোনো ধর্মে পুরানকাহিনীর জন্ম হইছে সেই ধর্মটা সৃষ্টি হওয়ার
আগেই। এই জাতীয় সৃষ্টি যতদিন ধইয়া লেখার অক্ষরে আছে, মানুষের মুখে মুখে
ঘূরছে তার চেয়ে বহুত বেশি সময় ধইয়া। এমনকি লিখিত হওয়ার পরেও কোনো

কোনোটা বেশ বদলাইছে। মহাভারত, রামায়ন, বিভিন্ন উপনিষদ, আরণ্যক প্রত্যেকটারই যুগ ও অঞ্চলভিত্তিক ভিন্ন ভিন্ন পাত্রলিপি পাওয়া গেছে।

এক রামায়নেরই পাওয়া গেছে বহু রকমের সংক্রন। মহাভারত, উপনিষদ এইগুলার অবস্থাও সেইকরমই। এতগুলা ভিন্ন ভিন্ন সংক্রণ যেখানে আছে সেইখানে এইসব বই থাইকা ঐতিহাসিক ঘটনার সময় নির্ধারণ করা কি কইরা সম্ভব? বিশ্বাসীদের জন্য এর ধর্মীয় মর্ম বা নির্দেশনটা জরুরি। অন্যান্যদের জন্য দরকারী হইল কাহিনীর সাহিত্যিক রস আর তার সারমর্মটা। এইগুলার কোনো একট কথা কবে, কত শত বা কত হাজার বছর আগে যুক্ত হইছে সেইটা ঠিক করার কোন উপায় নাই। তাইলে, এইসব পুরান যখন বই আকারে লেখা হইছে তখন সেই বইয়ের কোন একটা কথা লিখিত হওয়ার শত শত বা হাজার বছর আগের কোনো নির্দিষ্ট সময়ের কথা হিসাবে নেয়া কোনো মতেই উচিত হবে না, নেয়ার কোন যুক্তিও নাই। এ ধরনের তথ্যের ইতিহাসের তথ্য হিসাবে মানার তো কথাই আসে না। অন্য ভাষার পুরাণের নিয়া এইরকম ব্যাপক কোনো চেষ্টা হয় নাই সম্ভবত। অথচ এই অসম্ভব কাজটাই খুব সুষ্ঠ ও সফলভাবে করছেন হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস প্রকল্পের কাজীরা।

রামায়নের সবচেয়ে পুরানা পাত্রলিপি সাড়ে আটশ বছর বয়সী। বেদ বা মহাভারত বা বিভিন্ন পুরানের লিখিত পাত্রলিপির বয়স আরো কম। তাছাড়া, ধর্মের পুরানের কাহিনী বিশ্বাস করা না করাটা নিজ নিজ ধর্মীয় আবেগের সাথে যুক্ত। হিন্দু পুরান হিন্দুধর্মীয় মানুষ নিশ্চয়ই বিশ্বাস করেন। কিন্তু মুসলমান বা খ্রিষ্টান ধর্মের লোকেরা তা বিশ্বাস করবেন না। বিশ্বাস করার জন্য তাদের নিজস্ব পুরান আছে। আবার এক ধর্মের পুরানের তথ্যের উল্টাটা পাওয়া যায় আরেক ধর্মের পুরানে। মুসলমানের বিশ্বাসমতে আদম (আ:)-রে বেহেশত থাইকা বাইর কইরা শ্রীলঙ্কায় ফালায়া দেয়া হইছিল। আমরা মুসলমানরা কি আমাদের এই বিশ্বাস ইতিহাস হিসাবে চালায়া দিয়া বলতে পারব যে, শ্রীলঙ্কা আদম (আ:)-এর দেশ, কাজেই এইটা মুসলমানদের পরিত্র স্থান বিধায় মুসলমানদের অধিকারে দিতে হবে?

রঞ্জনীকান্ত রাখালদাসরা কিন্তু সেই কাজটাই করছেন। সাতআট বা নয়শ বছর বয়সী পাত্রলিপির পুরান কাহিনীর রেফারেন্স দিয়া দাবি কইরা বইসা আছেন আড়াই হাজার বছর আগেই আর্যরা বাংলাদেশ দখল কইরা নিছিল। গৌড়ের ইতিহাস-এর লেখক বলতেছেন: রামায়নে বঙ্গের নাম আছে। পুরান অনুসারে রামায়নের রচনাকাল খ. পূ. ২০০০ বছর। রামায়নে দশরথ বলিতেছেন অঙ্গ, বঙ্গ, কাশী, কোশল প্রভৃতির রাজারা তাহার অধীন ছিল। এই উদ্ভুতিটার প্রতি পাঠকের মনোযোগ চাইতেছি। লেখক দাবি করতেছেন রামায়নের রচনাকাল খ. পূ. ২০০০ বছর অর্থাৎ এখন থাইকা

চাইর হাজার বছর আগে। রামায়নে দরশরথ বলতেছেন বঙ্গ তার অধীনে। অতএব লেখক দাবি করতেছেন চাইর হাজার বছর আগেই আর্যরা বঙ্গ দখল করে।

এখন কথা হইল রামায়ন খ. পৃ. ২০০০ বছরের পুরানা- এই তথ্য তিনি কই পাইলেন? পুরানের রচনাকাল নির্দিষ্ট করা যায় না। মানুষের মুখে মুখে হাজার হাজার বছর ধইরা সেইটা একটু একটু কইরা বিকশিত হইতে হইতে আজকের রূপ পাইছে। আজকে রামায়নের যে রূপটা লেখক পড়তেছেন সেইটার বয়স তো আটশ বছরের মত। অথচ তিনি তার রেফারেন্স দিয়া দাবী করতেছেন চাইর হাজার বছর আগের বাংলাদেশ আর্যদের দখলে ছিল। এইরকম যুক্তিহীন, কান্ডজ্ঞানহীন কথাবার্তা ইতিহাসের অংশ হয়া থাকবে কেন?

আমরা আগেই ব্যাখ্যা করছি এই আনুমানিক ইতিহাস হাজির করার পেছনে আছে হিন্দুত্ববাদী বাসনা পুরনের পাগলামি। বাঙালির ইতিহাস নাই বইলা আহাজারি করতে করতে বক্ষিম বাঙালির ইতিহাস চর্চায় এই যে পুরানের বরাতে ইতিহাস পয়দা করার প্রবনতা জন্ম দিয়া গেছেন তা আমাদের ইতিহাসে কেবল পাহাড়ের সমান ময়লাছয়লা জমাইতে পারছে, প্রকৃত ইতিহাস লেখতে পারে নাই। পুরানরে ইতিহাস হিসাবে হাজির করার এই প্রবনতা বাঙালির সঠিক ইতিহাস লেখার পথে অন্যতম বড় বাধা।

উচু নাকি নিচু জাতের হিন্দু থাইকা জাত দিয়া বাংলাদেশের মুসলমানরা মুসলমান হইছে এইরকম কোন আলাপ হয় নাই বাংলার আদম শুমারির আগে। কথাটার শুরু ১৮৭২ সালের আদম শুমারির পর। এইটা আসলে বক্ষিমচন্দ্রের তোলা হিন্দুত্ববাদী আলাপ, যার গোড়াটা আদম শুমারিতে মুসলমান জনসংখ্যার হার বেশি হওয়ার মধ্যে। উনিশ শতকে হিন্দুত্ববাদ সংগঠিত হওয়ার সময় হিন্দুত্ববাদীরা মনে করতেন বাংলাদেশে হিন্দু বেশি, সেইখানে প্রাচীন ও মধ্যযুগেও হিন্দু বেশি আছিল। তখন এই রকম একটা কথা চালু আছিল যে প্রাচীন বাংলাদেশ আছিল একটা হিন্দুদেশ। এইটা নিয়াও প্রচুর বানোয়াট কথা ছড়ানো হইছে। ভুলভাল প্রচারের বিষয়টা বেভারলি ও তার রিপোর্টে উল্লেখ করছেন উইলিয়াম এডামের প্রসঙ্গে কথা বলতে গিয়া। ১৮৩৮ সালে দেশীয় শিক্ষার অবস্থা নিয়া প্রতিবেদন বানানোর সময় রাজশাহী যাওনের আগে উইলিয়াম এডামরে ধারনা দেয়া হয় রাজশাহী বিশেষভাবেই একটা হিন্দু জিলা। কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি থাইকা ১৮২৭ সালে ছাপা একটা বইয়েও লেখা হয় সেই জিলায় প্রতি দশজন হিন্দুতে ছয়জন মুসলমান (62.5% হিন্দু)। এডাম সাহেব রাজশাহী গিয়া নাটোর এলাকায় জরিপ কইরা দেখেন ঠিক উল্টাটা, মুসলমান ধর্মের মানুষ অনেক বেশি, 69% । আর, ১৮৭২ সালের প্রকৃত শুমারিতে দেখা যায় রাজশাহীতে মুসলমানের সংখ্যা প্রায় 78% । বুরোন অবস্থা! অথচ কলিকাতা থাইকা

ঘাপানো ফুলের পাঠ্য বইয়েও লেখা হইছে হিন্দুর সংখ্যা ৬২% প্রায়। (H. Beverly, 1872 : 130-31)

এইরকম একটা আন্দাজি ধারনার জন্য তাদেরই বা এত দোষ ধরি কেন, এই একুশ শতকে আইসাও বাংলাদেশের অনেক লেখক-বুদ্ধিজীবী-সাংবাদিক মনে করেন প্রাচীন কালে বাংলাদেশ ছিল হিন্দুদের দেশ। তারা ভূইলা যান বাংলা ভাষার প্রথম নমুনা বৌদ্ধদের লেখা কাব্য, বাংলাদেশের মাটি খুড়লেই পাওয়া যায় বৌদ্ধ বিহারের চিন, বহু পুরানা বইয়ে ছড়ায় আছে বৌদ্ধ-বাংলার সাবুদ।

১৮৭২ সালের আদম শুমারিতে দেখা যায় বাংলা প্রেসিডেন্সিতে মুসলমানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। শুমারিতে আদিবাসী ও উপজাতির মানুষদের হিন্দু হিসাবে তালিকাভুক্ত করা হইছিল। তাদের বাদ দিলে হিন্দু ধর্মের মানুষের সংখ্যা দাঢ়ায় এক কোটি চারিশ লাখ আর মুসলমানের সংখ্যা এক কোটি ছিয়াস্তর লাখ। বর্তমান বাংলাদেশের সীমানা ধইরা ১৮৭২ সালের শুমারির লোক সংখ্যা হিসাব করলে মুসলমানের হার নিশ্চয়ই আরও বেশি হইত। বেভারলির শুমারির পর মুসলমান জনসংখ্যা বেশি শুইনা হিন্দুত্ববাদীরা পুরা ঠাসকি খায়। কথা উঠে বেভারলির শুমারি ভুল। পরিস্থিতি যে এমন হইতে পারে সেইটা মনে হয় আগেই আন্দাজ করতে পারছিলেন বেভারলি। তাই এই বিষয়ে তার বুদ্ধিতে যতটা কুলাইছে সেইমত অভিনব একটা কৈফিয়ত দিয়া রাখেন ভূমিকায়। তিনি লেখেন:

The real explanation of the immense preponderance of Musalman religious element in this portion of delta (Rajshahi & Bogra) is to be found in the conversion to Islam of the numerous low caste which occupied it. . . . Exclusive caste system of Hinduism, again, naturally encourage conversion of lower orders from a religion under which they were no better than despised outcastes, to one which recognize all men are equals. (Beverley, 1872:132)

(দিয়া এলাকার এইভাগে (রাজশাহী ও বগুড়ায়) মুসলমান ধর্মের উপাদান অনেক বেশি হওয়ার আসল ব্যাখ্যাটা হইল এইখানে অসংখ্য নিম্নশ্রেণির হিন্দু আছিল, যারা মুসলমান হইছে। হিন্দু ধর্মের রক্ষণশীল জাতপাতের ব্যবস্থা নিচু জাতের মানুষদেরকে নিজ ধর্ম ছাইড়া সেই ধর্ম (ইসলাম) নিতে উঞ্চানি দেয় যেখানে সব মানুষ সমান। নিজদের ধর্মে তারা আছিলো জাতপাতেরও বাইরে তুচ্ছ মানুষ মাত্র। -লেখকের অনুবাদ)

এরপর বেভারলি আর সব জিলায় মুসলমানের সংখ্যা বেশি থাকার কারণগুলা বলেন এক এক কইরা। তার মতে বাকেরগঞ্জ অর্থাৎ আজকের বরিশাল এবং

ফরিদপুরে মুসলমান বেশি হওয়ায় কারন ঐ সব এলাকায় নাকি প্রচুর চাঁড়াল আছিল, যাদের বেশিরভাগই মুসলমান হয়া মুসলমানের সংখ্যা বাড়ায়া দিছে। রংপুরে দিনাজপুরে মুসলমান বেশি কারন ঐখানে কোচেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ আছিল, তারা সবাই মুসলিম শাসকদের থানা থাকতো। এদের প্রভাবে মুসলমান বাড়ছে। নোয়াখালির বিষয়ে তার ব্যাখ্যা আরো অভিনব। তার মতে, হিন্দুরা সমন্বের নাবিক পেশা নিলে তাদের জাতিনাশ হয়। কিন্তু নোয়াখালি মূলত নবিকদের এলাকা। তাই অইখানে বেশি মুসলমান। সীমান্ত এলাকা চট্টগ্রামে মুসলমান থানাদার, সেনাকেন্দ্র ইত্যাদি আছিল, যাদের বংশধররা এখন সেইখানে ভূমামী। তাই চট্টগ্রামে মুসলমান বেশি।

থেয়াল কইরা দেখেন বেভারলি এই দেশে মুসলমান বেশি হওয়ার ব্যাপারে এক এক অঞ্চলের একেক কারন উল্লেখ করছেন। তার মতে রাজশাহী বণ্ডা ফরিদপুর বরিশালের ক্ষেত্রে চাঁড়াল ইত্যাদি নিম্নশ্রেণির হিন্দু বেশি হওয়া, রংপুর দিনাজপুরে কোচ বেশি থাকা, নোয়াখালির লোক নাবিক পেশায় থাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহে প্রশাসনিক ও সেনাকেন্দ্র ইত্যাদি বেশি থাকা, এই কয় কারণে এইসব এলাকায় মুসলমান বেশি। এর মধ্যে বক্ষিম গরুরহরা কেবল প্রথম কারনটারেই নিছেন, অর্থাৎ নিম্নশ্রেণির হিন্দু বেশি কইরা মুসলমান হওয়ায় নাকি বাংলায় মুসলমান বেশি এবং এই কারনে মুসলমানদের মধ্যে ক্রমক্রম বেশি। হিন্দুভূবাদী প্রকল্পের উদ্দেশ্য পুরনে যেটা সহজতা করবে শুধু সেই কথাটাই তারা প্রচার করছেন, অন্যগুলো বলেন নাই।

তারা বুঝতে পারছিলেন নিচু জাতের হিন্দু থাইকা মুসলমান হওয়ার বিষয়টারে আমঙ্গনতার মধ্যে ছড়ায়া দিতে পারলে সাধারণ মুসলমান জনগোষ্ঠীর মানসিক মেরুদণ্ড ভাইস্পা মেলা যাবে। তাইলে তারা বিশ্বাস করবে যে, তারা নিচু জাতের হিন্দু থাইকা আসা মানুষ, বড় জাতের হিন্দুরা হিন্দুই রয়া গেছে, কাজেই হিন্দুরা তাদের থাইকা বড়। ঠিক এই উদ্দেশ্যেটাই ছিল হিন্দুভূবাদীদের। একটা জনগোষ্ঠীর মানুষকে এই তদ্দে গিলাইতে পারলে আর কিছু করার দরকার পড়ে না। কয়েক প্রজন্মের মধ্যে সে আর মেরুদণ্ড সোজা কইরা দাঁড়াইতে পারবে না।

বক্ষিমের এই ধাচারনা কিন্তু কাজে লাগছিল। আজকের আধীন বাংলাদেশেও দেখা যায় লেখক বৃক্ষিজীবীরা এইসব কথার পুনরাবৃত্তি করতাছেন, ইতিহাসের তথ্যপ্রমাণ ধাঁইটা দেখার প্রয়োজন বোধ করতেছেন না। এইবার দেখা যাক এইসব তদ্দের তলায় কোনো প্রামাণ্য ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা।

যেখানে মুসলিম শাসকদের থানাদার সেনাকেন্দ্র ইত্যাদি ছিলো সেইখানে যদি মুসলমান জনসংখ্যা বেশি হইত তাইলে মুর্শিদাবাদ, রাজমহল (সাহেবগঞ্জ জিলা), সাতগাঁও, পুর্ণিয়া, পাটনা, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি সব জায়গায় মুসলমান বেশি থাকত।

কারণ অইগুলা আছিলো মুসলমান শাসকদের রাজধানী বা বড় প্রশাসনিক কেন্দ্র। কিন্তু অই সব এলাকার কোনটাতেই মুসলমান জনসংখ্যা হিন্দুর তুলনায় বেশি না। বরং বেশিরভাগ জায়গাতেই যা তা কম। এর থাইকা বুঝা যায় যে, বেভারলির এই কথা একেবারে যুক্তিহীন, বাজে অনুমান মাত্র।

রংপুর দিনাজপুরে আদিবাসী ও উপজাতীয় কোচ বেশি হওয়ায় মুসলমান হইলে বাঁকুড়া, বীরভূম সাঁওতাল পরগণা প্রভৃতি এলাকায় বাগদি সাঁওতাল বেশি ছিল বইলা সেইখানে মুসলমান বেশি হওয়ার কথা। কিন্তু সেই সব জায়গাতেও মুসলমান কম। তাই বেভারলির এই যুক্তিটারেও আমরা অযুক্তির চিন্দিলাম।

নোয়াখালির বেশিরভাগ মানুষ নাবিক বইলা তারা মুসলমান এইডারে উড়ট কথা ছাড়া আর কি বলা যায়! হিন্দুরা নাবিক হইলে যদি জাত চইলা যাইত তাইলে মুসলমান আসার আগে সারা ভারতে, বিশেষ কইরা দক্ষিণে তাদের ব্যবসা বানিজ্য কেমনে চলতো? বাঙালি রাজপুত্র বিজয়ের সিংহলযাত্রা এবং সিংহলে উপনিবেশ বানানোর কাহিনী কিভাবে সৃষ্টি হইল? এইটা যে একটা উড়ট হাস্যকর কথা তা মনে হয় আর বুঝায়া বলার দরকার নাই। এইবার আসি ছোট জাতের প্রসঙ্গে।

বর্ণ বা জাত পাত নিয়া ভাগাভাগি, নির্যাতন, অত্যাচার ভারতের হিন্দু জনগোষ্ঠীর চিরদিনের বাস্তবতা। ভারতে হিন্দু ধর্ম সংগঠিত রূপ পাওয়ার পর থাইকা প্রত্যেকটা অঞ্চলে আমজনতা এমন কিছু সংখ্যালঘু মানুষের দ্বারা নির্যাতিত হয় আসছে যারা নিজেদেরকে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরিচয় দিত। তারা প্রচার করতো যে, সাধারণ মানুষ মানুষ হিসাবেই নিচু জাতের। এরমধ্যে বৈশ্যরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দের সেবার জন্য পশুপালন চাষবাস কেনবেচা করবে, আর শুদ্ররা বাকি তিনজাতের সেবা করবে। এইটাই দেবতাদের নির্দেশ। তার সাক্ষী হিসাবে ধর্মের বইপত্রেও এইসব কথা লেখা আছে।

যাইহোক, মধ্য প্রদেশ ও উত্তর প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে তথাকথিত নিচুজাতের হিন্দু মানুষের বাস আছিল, এখনো আছে। হিন্দু ধর্মীয় লেখাজোকাতেও এ অবস্থার বিবরণ পাওয়া যায়। মোট কথা ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় পরিচয় দেয়া মানুষগুলার সংখ্যা নগন্য, তাদের তুলনায় নিচু জাতের দাগলাগা হিন্দুর সংখ্যা অনেক বেশি।

বেভারলির কথামত নিচু জাতের হিন্দুরা হিন্দু সমাজে নির্যাতিত হওয়ার কারনে মুসলমান হয়া থাকলে সারা ভারতেই মুসলমানের সংখ্যা বেশি হওয়ার কথা। বিশেষ কইরা পাঞ্জাব, দিল্লী, বিহার, মধ্য প্রদেশ, উত্তর প্রদেশ এইসব এলাকায় অবশ্যই মুসলমান বেশি থাকতো। পাঞ্জাবে এই একুশ শতকেও ৩২% শিডিউল কাস্ট, সাথে যোগ হবে উপজাতিগুলা, সব মিলায় ৪০% ছাড়ায়া যাওয়ার কথা। অর্থাৎ পাঞ্জাবে মুসলমানের হার ১.৯৩%। মধ্য প্রদেশে শিডিউল কাস্ট শিডিউল ট্রাইব মিলায় ৩৬%, অর্থাৎ মুসলমান ৭%-এরও কম। দিল্লীতে মুসলমান ১৩% প্রায়। বিহারে

শিডিউল কাস্ট ও ট্রাইব মিলায়া ৬৩%, অথচ মুসলমান মাত্র ১৭%। দেখা যাইতেছে যেখানে নিম্নশ্রেণির মানুষ বেশি আছিল সেইখানে মুসলমান বেশি হইছে এই কথাটা ঠিক না। উপরের পরিসংখ্যান থাইকা বুঝা যায় বেভারলির এই ব্যাখ্যা কটা যুক্তিহীন, কিরকম দুনিয়াছাড়া।

আসলে, বাংলাদেশ একটা হিন্দুদেশ বা হিন্দু প্রধান দেশ আছিল- এইটাই একটা ভুল বা বানোয়াট অনুমান, যেটা উনিশ শতকে সৃষ্টি হইছে। এই ভুল অনুমানের উপর থাড়ায়া যত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষন-সিদ্ধান্ত হবে তার সবই ভুল হইতে বাধ্য।

প্রাচীনকাল থাইকা বারো শতক পর্যন্ত পুন্ড-বঙ্গ-সমতট ছিল বৌদ্ধ রাষ্ট্র। সেখানে বৌদ্ধ ধর্মের মানুষ আছিল সবচেয়ে বেশি। তবে এগার বারো শতকের দিকের বৌদ্ধধর্ম গৌতমবুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মত থাইকা অনেকটাই বদলায়া গেছিল, ভাগ হইছিল নানা মতে। এমনকি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর বাইরে সহজিয়া ধর্মত হিসাবে পরিচিত বজ্র্যান, তত্ত্বাদিরও উজ্জব হইছে তখন। বাংলাদেশে এক সময় নাথপঞ্চীরাও যথেষ্ট ছড়ায়া পড়ছিল, অনেকে যাদেরকে হিন্দু ধর্মেরই একটা ডাল মনে করে। যাইহোক, ঐতিহাসিক কাল থাইকা বৌদ্ধদের ধারাবাহিক প্রাধান্যের কথা পাওয়া যায়।

আলেকজান্দ্রের ভারত অভিযানের (৩২৭ খ্রি.পূ.) সময় থাইকা খিটীয় দুই শতক পর্যন্ত সেই কালের গ্রীক ও অন্যান্য ভিন্নদেশি লেখক যেমন হেরোডোটাস, মেগাস্থিনিস, প্লিনী, পেরিপ্লাস অব দ্যা ইরিত্রিয়ান সী'র অজ্ঞাত লেখক, টলেমি, এদের মারফত জানা যায় সেই পাঁচশ বছর এই অঞ্চলে শক্তিশালী স্বাধীন রাজ্য ছিলো। দিওদোরাস ও পুটার্কের উল্লেখে এই অঞ্চলের নাম গঙ্গারিডি। ভারতের কোনো রাজা কিংবা আলেকজান্দ্রাও বসের শক্তিশালী সেনাবাহিনীর ভয়ে এদিকে আগায় নাই।

এরপর ফাহিয়েনের ভ্রমন (৩৯৯-৪১২) থাইকা জানতে পারতেছি গোটা ভারতে তখন বৌদ্ধ ধর্মই সংগঠিত ধর্মত। ভ্রমনের শেষের দিকে ফাহিয়েন পশ্চিবসের তমলুক আইসা দুই বছর থাকেন। তিনি দেখতে পান দেশে ২৪টি সংঘারাম আছে এবং এই দেশের মানুষেরা বৌদ্ধধর্মই মানে (Legge, Chapt. 37)। এইদিকে, সমতটে বৌদ্ধ শাসন ছিল ছয়-সাত শতক থাইকা নয় শতক পর্যন্ত।

৬৩৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে হিউয়েন সাঙ কর্ণসুবৰ্ণ, পুন্ডবর্ধন, সমতট ও তমলুক ভ্রমন কইরা লেখেন, তখন বৌদ্ধ ধর্মের পসার সবচেয়ে বেশি, এরপর জৈন ধর্ম। বিষ্ণু বা শিবের অনুসারীদের (এখনকার হিন্দু) কথা আলাদা উল্লেখ নাই। পুন্ডবর্ধনের প্রসঙ্গে তিনি লেখছেন: এখানে কুড়িটির মত সংঘারাম আছে। ভিক্ষু আছেন তিনি হাজার প্রায়। হীনযান ও মহাযান দুয়েরই চর্চা করেন তারা। শখানেকের মত

দেবমন্দির আছে। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অন্য-ধর্মীরা সেখানে বাস করেন। নগ্ন নির্ত্তন উপাসকদের সংখ্যা সব থেকে বেশি। (প্রেময়, ২০১৬: ১৪০)

সমতটে তিরিশটা সংঘারাম ও দুই হাজারের মত ভিক্ষু, তমলুকে দশটা সংঘারাম এক হাজার ভিক্ষু এবং কর্ণসুবর্নে ১৩টা সংঘারাম দুই হাজার ভিক্ষু ছিল বইলা উল্লেখ করছেন হিউয়েন সাঙ। প্রত্যেক অঞ্চলে অন্যান্য বহু ধর্মের অনেক অনুসারী এবং তাদের বহু মন্দিরও দেখেন তিনি। তবে নগ্ন নির্গঠিতদের (জৈন) সংখ্যা বেশি পান (প্রেময়, ২০১৬ : ১৪৩-৪৪)। মোট কথা হিউয়েন সাঙের সময়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মই প্রধান ধর্ম। এর পরই জৈনদের অবস্থান।

হিউয়েন সাঙের বিবরণ থাইকা আন্দাজ করা যায় তখন জনসংখ্যার কমপক্ষে অর্ধেক ছিলো বিভিন্ন আদিবাসী অস্ত্রিক ধর্মের অনুসারী। তাইলে বাকি অর্ধেক ছিলো বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু। এর মধ্যে বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সে হিসাবে জনসংখ্যার অন্তত ২০-২৫% বৌদ্ধ, ১৪-১৫% জৈন ও আজিবীক, ১০%-এর মত হিন্দু ছিলো বইলা ধরা যায়। পরবর্তী চারশ বছরের পাল শাসনামলে বৌদ্ধদের সংখ্যা কমে নাই, বরং বাড়ছে। তবে দশ শতকের পরে জৈনদের সংখ্যা কমছে। এর মধ্যে জৈন ধর্মবদল, আদিবাসী ধর্মবদল এবং সেনদের তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছরের নির্যাতনের কারনে আরও ১০-১৫% লোক হিন্দু হইছে ধইরা নিলেও বখতিয়ার খিলজীর অভিযানের আগে বাংলায় হিন্দুর সংখ্যা কোনোমতেই ২৫%-এর বেশি থাকার কথা না। সেন আমলেও যে বৌদ্ধরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল সেই কথাও বিভিন্ন সূত্র থাইকা পাওয়া যাইতেছে। নগেন্দ্রনাথ বসু তার বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস গ্রন্থে লেখছেন: সেনবংশের অভ্যুদয়কালে গৌড়, রাঢ় ও বঙ্গে সর্বত্রই তাত্ত্বিক প্রভাব।— জনগণের অধিকাংশই মহাযান তাত্ত্বিক সম্প্রদায় বা ধর্ম-সম্প্রদায়-ভুক্ত ছিল, কেহ কেহ জৈন ধর্মাবলম্বীও ছিলেন (নগেন্দ্রনাথ, ১৩২১ : ৩২৭)। প্রথম দিকে বল্লাল সেন নিজেও বৌদ্ধ তাত্ত্বিক মতে তালিম নিছিলেন বইলা উল্লেখ করছেন নগেন্দ্রনাথ। কারণ ঐ সময়ের বুদ্ধিবৃত্তির হালফ্যাশন ছিল বৌদ্ধ মহাযানী তাত্ত্বিক ধর্মচর্চা।

পালদের পর আশি বছরের জন্য ক্ষমতায় আসে সেনরা। এরা কর্ণাটকের মানুষ, অবাঙালি। বাংলা তাদের ভাষাও না। তাদের ভাষা কানাড়া বা তেলেগু হওয়ার কথা। আর ধর্মচর্চার ভাষা সংস্কৃত। এইদেশে পোক্ত হয়া বসার পর সেনেরা সংস্কৃত ভাষার চর্চা শুরু করে। ভারতের বিভিন্ন জায়গা থাইকা ব্রাহ্মণদের আইনা এইখানে বসত করায়। ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য যাতে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ব্রাহ্মণ-বিদ্বেষীদের ঠিকমত শাস্তি হয় সেইজন্য রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে ৩১৪ জন ব্রাহ্মণ বসায়া দিছিলেন বল্লাল সেন (নগেন্দ্রনাথ, ১৩২১: ৩৩৩-৩৪)। এদের দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় খোলা হয় সংস্কৃত টোল। বাংলা ভাষার চর্চা একেবারে বন্ধ হয়া যায়। বাঙালি কবি জয়দেব সংস্কৃত কাব্য গীতগোবিন্দের জন্য বিখ্যাত হয়া আছেন, কিন্তু একটা অক্ষরও বাংলা

লেখেন নাই। এর থেকে আন্দাজ করা যায় সেই সময় কতটা অবরুদ্ধ অবস্থায় ছিল বাংলা ভাষা।

বলতে গেলে সেন আমলেই সংগঠিত ব্রাহ্মণবাদের চর্চা শুরু হয় বাংলাদেশে। অন্য ধর্মের মানুষদের উপর চলে নানা রকম নির্যাতন। কেবল যে অন্য ধর্মের মানুষের উপর অত্যাচার চলে তা না, হিন্দু ধর্মের মানুষদেরকেও নানা জাতপাতে ভাগ কইরা বেশিরভাগ মানুষের রাজা আর ব্রাহ্মনের সেবাদাসে পরিণত করা হয়। তার স্বেচ্ছাচারী কৌলিন্যপ্রথা এবং জাত বিভাগের বিরুদ্ধে যারা কথা বলতে গেছে তাদের উপর নাইমা আসছে ভয়াবহ নির্যাতন। ভয়ে দেশ ছাইড়া পালায়া গেছে বহু হিন্দুও।

বল্লাল সেনের সময় অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়া কিছু কিছু বৌদ্ধ হিন্দু হয়া যায়। নেপালে পালায়া যায় অনেক বৌদ্ধ ধর্মগুরু, শিক্ষক, লেখক। তখনই নেপালে বাংলা সাহিত্যের চর্চা শুরু হয় (Dinesh Chandra Sen, 1954 : 6)। এর বিবরণ পাওয়া যায় সমকালীন সাহিত্য এবং পরবর্তী কোনো কোনো রচনায়। এসব উল্লেখ করা হইছে লামা তারানাথের ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস বইয়েও। তারানাথ বলছেন যে, বৌদ্ধ ভিক্ষুদের একটা দল বখতিয়ার খিলজির কাছে আগায়া যায় এবং বাংলা আক্রমনে উকানি দেয় (Taranath, 1990: 318-20)।

যাইহোক, এই অবস্থা সৃষ্টি হইছিল বল্লাল সেনের আমলে অর্থাৎ ১১৫৮ সালে তার ক্ষমতা গ্রহনের পরে। ১১৭৯ সালে লক্ষ্মন সেন সিংহাসনে বসেন। বল্লাল সেন প্রথম জীবনে বৌদ্ধ তাত্ত্বিক ধর্মের তালিম নিছিলেন। ব্রাহ্মণবাদী হইছেন পরে। কাজেই ধইরা নেয়া যায় বৌদ্ধদের উপ্রে সেনদের চরম অত্যাচার চলছিল বল্লাল সেন ক্ষমতায় বসার কিছুকাল পর থাইকা লক্ষ্মনসেনের পরাজয় পর্যন্ত, আনুমানিক তিরিশপঁয়ত্রিশ বছরের মত। তখন:

রাজা ও রাষ্ট্র উভয়ই বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিরুদ্ধ হইলে বাংলার বৌদ্ধরা বাংলার ছদ্মে ছাড়িয়া নেপাল, তিক্তত প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। বাঙালার বৌদ্ধ সাধক কবিদের দ্বারা সদ্যোজাত বাঙালা ভাষায় রচিত গ্রন্থগুলিও তাহাদের সঙ্গে বাঙালার বাহিরে চলিয়া যায়। তাই আদিযুগের বাঙালা গ্রন্থ নিতান্ত দুর্ঘাপ্য (দেবেন্দ্র, ১৯৫৯ : ৯-১০)।

সংস্কৃত ভাষা ও হিন্দু ধর্মের আচারসংস্কার প্রচারের পথে সাধারণ বৌদ্ধ জনগণ বাধা হওয়ার কথা না। এফেতে কেবল ধর্মগুরু, শিক্ষার্থী, লেখক, শিক্ষক অর্থাৎ বিহারগুলির সাথে জড়িত বৌদ্ধরাই সেনদের রোষানলে পড়ার কথা। বাস্তবে তা-ই ঘটিটা থাকবে, এ শ্রেণির বৌদ্ধরাই ব্রাহ্মণবাদী অত্যাচার থাইকা বাঁচার জন্য নেপাল তিক্ততে পালায়া গিয়া থাকবে। এর পরিণামে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা এবং

বৌদ্ধদের জ্ঞান সাধনা বন্ধ হয়া গেছিল। তবে এত অল্প সময়ে ধর্মগুলার জনসংখ্যার হারে বিরাট কোনো বদল আসার মত অবস্থা হওয়ার কথা না।

এ পরিস্থিতিতে তুর্কি আক্রমনের সময় নির্যাতিত বৌদ্ধরা মুসলমানদের পক্ষ নেয়। যখন গৌড়-রাঢ়বাসী উচ্চ হিন্দুসমাজ অলীক আশঙ্কায় বিব্রত, সেই সময় গৌড়ের নিগৃহীত (বৌদ্ধ) ধর্ম সম্প্রদায় মুসলমানগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন (নগেন্দ্রনাথ, ১৩২১: ৩৪৫)। তুর্কিরা ক্ষমতায় আসলে এইসব নির্যাতিত বৌদ্ধরা দলে দলে ইসলাম গ্রহন করে। তাই বাংলাদেশের যেখানে বৌদ্ধ বেশি ছিলো সেইখানে মুসলমানও বেশি। যেমন রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, কুমিল্লা (ত্রিপুরা)। রাজশাহীতে সোমপুর বিহার ও জগদ্দল বিহার পৃথিবী বিখ্যাত, দিনাজপুরের পার্বতীপুর নবাবগঞ্জে পাওয়া গেছে প্রাচীন বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ, রংপুরে বদরগঞ্জে খুঁড়াখুঁড়িতে উইঠা আসছে লোহানীপাড়া বৌদ্ধবিহারের কাঠামো, সম্প্রতি পাবনায় পাওয়া গেছে প্রাচীন বৌদ্ধ মন্দিরের চিন্ময়, বগুড়া আর কুমিল্লায় তো বহু স্থাপনা আবিষ্কৃত হইছে যাতে প্রমাণ হইছে এই দুই জিলা বড়সরো বৌদ্ধ কেন্দ্র ছিলো। এইসব জিলাতেই মুসলমানের হার অনেক বেশি।

একটা সহজ হিসাবে গেলেও চলে। আমরা খুব যৌক্তিকভাবে দেখছি ১২০০ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু ধর্মীয়দের হার বড়জোর ২৫-৩০% হওয়ার কথা। বৃটিশ আমলে ১৮৭২-এর আদম শুমারিতে বাংলায় হিন্দু মানুষের হার দাঢ়ায় ৩৭-৩৮%-এ। বাকী প্রায় সবই মুসলমান। এই সংখ্যাগুরু মুসলমান যদি হিন্দু ধর্মের মানুষদের থাইকা আসতো তাইলে হিন্দুদের সংখ্যা কইমা যাওয়ার কথা, বাড়ে কি কইরা? কমছে বৌদ্ধ, জৈন ও আদিবাসী ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যা। এর থেকেও সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে, মূলত বৌদ্ধ, ও আদিবাসী মানুষদের বেশির ভাগ মুসলমান হইছে। জৈনরা খুব সম্ভবত প্রায় সবাই হিন্দু হইছে। সেইজন্য মুসলমান দ্রুত ও অনেক বাড়ছে, আর তুলনামূলকভাবে কম হইলেও হিন্দুর সংখ্যাও বাড়ছে। বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ ও কায়ছ জাতির ইতিহাস লেখক নগেন্দ্রনাথ বসুও এমন মতই জানাইছেন: পূর্ববঙ্গে যে বহুসংখ্যক মুসলমান দেখা যায়, তাহাদের অধিকাংশই সেই প্রাচীন বৌদ্ধ জনসাধারণের বংশধর বলিয়াই মনে হয় (নগেন্দ্রনাথ বসু, ১৩২১: ৩৬০)।

বেভারলি বাংলাদেশের জনসমাজের ধর্মীয় রদবদলের হাজার হাজার বছরের ইতিহাস জানতেন না। তাই সাধারণ কান্তজ্ঞান থাইকা বলছিলেন যে, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, পাবনা, কুমিল্লায় নিম্নশ্রেণির হিন্দুরা দলে দলে মুসলমান হওয়ায় সেইসব এলাকায় মুসলমানের হার বেশি। আসলে এইগুলি ছিল বৌদ্ধ প্রধান এলাকা। মুসলমানদের আক্রমনের সময় সেখানে বৌদ্ধরাই সংখ্যাগুরু, হিন্দু ধর্মীয় এলাকা। মুসলমানদের আক্রমনের সময় সেখানে বৌদ্ধরাই সংখ্যাগুরু, হিন্দু ধর্মীয় লোকের সংখ্যা ছিল অনেক কম। কাজেই হিন্দুরা মুসলমান হওয়ার কারনে সেইখানে মুসলমান বেশি হওয়া সম্ভব ছিল না। কেবল সংখ্যাগুরু বৌদ্ধরা দলে দলে মুসলমান

হয়া থাকলেই মুসলিম জনসংখ্যা বেশি হইতে পারে। রজনীকান্ত চক্ৰবৰ্ত্তিৰ লেখছেন: উৎপৌত্তি হইয়া অনেক বৌদ্ধ মুসলমান ধৰ্ম অবলম্বন করে। উত্তর ও পূৰ্ব বাঙালায় এই ঘটনা বিশেষৱৰপে ঘটিয়াছিল বোধ হয় (রজনীকান্ত, ১৩১৭: ২২৪)। এইসব তথ্য বক্ষিমচন্দ্ৰ, রাজেন্দ্ৰলাল বা নিখিলনাথদেৱৰও জানা থাকার কথা। তাৰপৱেও তাৰা সত্য কথাটা বলেন নাই।

এই বিষয়ে আৱেকটা শক্ত সমাজ-ভাষাতাত্ত্বিক প্ৰমান উল্লেখ কৰতে চাই। কিছুদিন আগেও গ্ৰামাঞ্চলে হিন্দুৱা মুসলমানদেৱকে গাইল দিত ‘নেড়েৰ জাত’ কয়া। যাদেৱ মাথা কামানো তাদেৱকে ‘নাইড়া’ ‘নেড়ে’ কয়। মুসলমানৱা তখন মাথা কামাইত না, বাবৰি চুল আৱ দাঢ়ি রাখত। বৌদ্ধ শ্ৰমণ এবং সাগৱেদৱা এখনো মাথা কামায়া রাখে, তখনো এইৱকমই রাখত। মুসলমানৱা ক্ষমতায় আসাৱ পৱ ‘নেড়ে’ (মাথা কামানো) বৌদ্ধৱা দলে দলে মুসলমান হয়। মুসলমান হইলেও মাথা কামায়া রাখাৰ অভ্যাস হয়ত এক জন্মে ছাড়তে পাৱত না। তাই মুসলমান সমাজে নাইড়া মাথাৰ লোকই চোখে পড়ত বেশি। এইজন্য হিন্দুৱা মুসলমানদেৱকে গাইল দিত ‘নেড়ে’ কয়া, অৰ্থাৎ নেড়ে মুসলমান। ‘নেড়ে’ গালিটাৰ মধ্যেও প্ৰমান আছে প্ৰধানত বৌদ্ধৱাই মুসলমান হইছিল।

চট্টগ্ৰাম নোয়াখালিৰ সাথে ব্যবসা ও অন্যান্য দৱকাৱে আৱব বনিকদেৱ যোগাযোগ বহু পুৱানা কালেৱ বিষয়। এই যোগাযোগ মাৱফত আৱব ব্যবসায়ীৱা নোয়াখালি ও চট্টগ্ৰাম এলাকায় ইসলাম প্ৰচাৱ কৰতেছিল তুৰ্কি বিজয়েৱ অনেক আগে থাইকা। দশ শতকে ইৱাকি ভৃগোলবিদ ও ইতিহাসবিদ আল মাসুদি বলছেন বাংলাদেশেৱ দক্ষিণে একটা মুসলিম জনগোষ্ঠীৱ বাস ছিলো এবং মুসলমান সমাজেৱ লোকেৱো শানীয়দেৱ দেখাদেখি হাতিৱ গোশত থাইত (Eaton, 1993: 11)। বখতিয়াৱ খিলজি আসাৱ অনেক আগে চট্টগ্ৰাম নোয়াখালিতে মুসলিম সমাজ গইড়া উঠে। তাৰ দ্রুত ব্যাপক প্ৰসাৱ ঘটে মুসলিম শাসন কায়েম হওয়াৱ পৱ। এই কাৱনে সেই অঞ্চলে মুসলমানৱা সংখ্যাগৱিষ্ঠ।

সুবিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদ আৱ খালবিল হাওড়ে ভৱা ময়মনসিংহে যোগাযোগ ও চলাচল কঠিন হওয়ায় সেইখানে হিন্দু ধৰ্ম ও সেনদেৱ শাসনেৱ দখল কতদূৰ আছিলো তা তৰ্কেৱ বিষয়; এইটা নিয়ে অনেকে সন্দেহ পোষন কৱেন। নীহারৱজ্ঞন রায়ও লক্ষ্য কৱছেন, “মৈমনসিংহ-ত্ৰিপুৱা-চট্টগ্ৰাম-শ্ৰীহট্টে ব্ৰাহ্মণ্য সৃতিৱ শাসন আজও কিছুটা দুৰ্বল”(নীহার, ১৯৬০: ৫৬)। কেদারনাথ মজুমদাৱ মনে কৱেন সেনদেৱ আমলে পূৰ্ব-ময়মনসিংহ এলাকায় গাড়ো-কোচ-হাজং প্ৰভৃতি জাতেৱ ছোট ছোট আধীন রাজ্য গইড়া উঠছিলো। হয়ত পূৰ্ব ময়মনসিংহ কেবল সেনদেৱ কৱেৱ আওতায় আইসা থাকতে পাৱে (কেদারনাথ, ১৯৮৭: ১২-১৩)। ফলে এই এলাকায়

হিন্দু ধর্ম কোন যুগেই তেমন বিষ্টার লাভ করতে পারে নাই। উপজাতি এবং স্থানীয় প্রান্ধর্মের অনুসারীই ছিলো বেশি। তাই তুর্কি বিজয়ের আগেও সেইখানে পীরেরা ধর্ম প্রচার করতে পারছেন। নেত্রকোনার সদর উপজেলার মদনপুরে সেই দশ শতকেই শাহ সুলতান কর্মরাত্তিনি কুমী খানকা বানায়া ধর্মপ্রচার করছেন। বখতিয়ারের পরে মূলত মুসলমান আমলে এ অঞ্চলে স্থায়ী প্রশাসনিক কেন্দ্র গইড়া উঠতে থাকে। সেইসঙ্গে ধর্ম প্রচারে আসেন প্রচুর পীর ফকির সুফি দরবেশ। এ জন্যই ময়মনসিংহে মুসলমান বেশি।

এতসব বিপরীত তথ্য-প্রমান থাকা সত্ত্বেও বক্ষিমচন্দ্র-রাজেন্দ্রলাল থাইকা শুরু কইরা তথাকথিত অসাম্প্রদায়িক ইতিহাসকার রমেশচন্দ্র মজুমদারও বেভারলির কথাটাই নেন এবং প্রচার করেন। বক্ষিমচন্দ্রের মুসলিম-বিদ্রে গোপন কোন বিষয় না, তার প্রায় সব লেখায় সেই প্রমান পাওয়া যায়। কিন্তু রমেশচন্দ্র মজুমদার, যিনি বন্ধনিষ্ঠ নিরপেক্ষ ইতিহাস চর্চার সবক দিতেন, নিজে কিভাবে হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস প্রকল্পের কল্পকাহিনী অর্থাৎ ‘নিম্নশ্রেণির হিন্দু থাইকা বেশি লোক মুসলমান হইছে বইলা বাংলাদেশে মুসলমান বেশি’ কথাটারে ইতিহাস হিসাবে লেইখা গেলেন তা আমাদের কাছে আশ্চর্যের বিষয়।

আরেকটা কথা ভাববার মতো। বক্ষিমের মত আমরাও যদি ধর্মের ভিত্তিতে সমাজেরে ভাগ করি তাইলে দেখব অই যুগেও ছিল একদিকে হিন্দু জনগোষ্ঠী, আরেক দিকে মুসলমান। অর্থ-সম্মান-বর্ণ-ক্ষমতার বিচারে হিন্দু জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্র একটা ছোট অংশ তথাকথিত উচ্চশ্রেণির, বাকি সবাই নিম্নশ্রেণির। একইভাবে মুসলমানদের ক্ষুদ্র একটা অংশ উচ্চশ্রেণির শাসক, বাকিরা নিম্নশ্রেণির কর্মীমতো। শ্রেণি বিচারে দুই ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর গড়নে কোন পার্থক্য নাই কইলেই চলে। এখনো সেইটা নাই। এই যাবত আলোচনায় যেসব তথ্য প্রমান যাচাই করছি তাতে দেখা যায় মুসলিম শাসন কায়েম হওয়ার সময়টায় বৌদ্ধরাই ছিলো গনায় সবচেয়ে বেশি। কিন্তু ধর্ম বাদ দিয়া আর্থ-সামাজিক অবস্থার নিরিখে সেই সময়ের জনসমাজের দেখলে বুঝা যায় সেই যুগেও অল্প কিছু মানুষ ব্রাক্ষন-ক্ষত্রিয় তকমা লাগায়া সমাজের বাকি মানুষদেরকে শোষন করছে, খাটাইছে। সুবিধাবাদী গোষ্ঠীটার হার ১০-১৫% এর চেয়ে বেশি হওয়ার কথা না। এমন একটা সমাজে যখন ইসলাম ধর্মে জাত দেয়া শুরু হইল তখন হারাহারি হিসাবে ১ জন ব্রাক্ষন/ক্ষত্রিয়/বৈশ্যের পাশাপাশি ৬/৭জন সাধারণ বৌদ্ধ বা হিন্দু জাত দিয়া মুসলমান হওয়ার কথা। বাস্তবে তা-ই হইছে। অন্যদের তুলনায় কম হইলেও বহু ব্রাক্ষন, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য মুসলমান হইছে।

শামসুন্দিন ইলিয়াস শাহ বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের এক ব্রাক্ষন মেয়েরে বিয়ে করছিলেন বইলা শোনা যায়। (Bhattachari, 1922 : 83)। মুহাম্মদ খানের

দাদার বাপ মাহী সওয়ার, ঈসা খাঁ, শমসের গাজী এদের প্রত্যেকে ব্রাহ্মণ নারী বিয়ে করেন এবং সেই বিয়েতেই তাদের মূল বংশধরদের সৃষ্টি। একইভাবে বাড়তি সুবিধা পাওয়ার জন্য অনেক হিন্দু ভূঁস্মামী মুসলমান হয়। সংস্কৃত বই অমৃতকাণ্ডে আছে লখনোতির কাজী রুকনউদ্দিন সমরকন্দীর কাছে মুসলমান হন এক বেদান্ত ব্রাহ্মণ এবং কামরূপের অস্ত্রানাথ নামের এক সাধুপুরুষ (রহিম, ১৯৮২: ৫৫-৫৭)। গনেশের ছেলে যদুর মুসলমান জালালউদ্দিন হওয়ার কথা তো সবার জানা। দাউদ খানের বিখ্যাত সেনাপতি কালাপাহাড় নাকি ছিলেন কায়স্ত হিন্দু থাইকা মুসলমান হওয়া মানুষ। ঈসা খাঁর বাপও নাকি হিন্দু থাইকা মুসলমান হইছিলেন। মুর্শিদ কুলি খাঁ, খান জাহান আলীর উজির মুহাম্মদ তাহির, শাহজাদপুরের জমিদারের ছেলে রঘু রায়, সিংহটিয়ার জমিদার কামালউদ্দিন ও জামালউদ্দিন চৌধুরী আগে তথাকথিত উচ্চ জাতের হিন্দু আছিলেন। নেত্রকোনার খালিয়াজুরির হোম চৌধুরী পরিবারের এক অংশ হিন্দু থাইকা জাত দেয়া মুসলমানের বংশধর। বাংলাদেশে সব অঞ্চলে বহু মুসলমান পরিবার আছে যারা এখনো ঠাকুর, বিশ্বাস প্রভৃতি হিন্দু উপাধি ব্যবহার করে। সারা দেশে এই রকম অসংখ্য নজির ছড়ায় আছে। হিন্দুধর্মের কথিত উচ্চজাতের প্রচুর লোক যে মুসলমান হইছে এইগুলা তো তার অকাট্য প্রমাণ।

দ্বিতীয় কথা হইল, তুর্কি, আরব, ইরানী, আবিসিনীয়, আফগান মুগল এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য অঞ্চলের বহু মানুষ দলে দলে বাংলায় আইসা বসতি করে। বখতিয়ার খিলজি থাইকা শুরু কইরা মুগল আমল পর্যন্ত সাধারণ সৈন্য আমিরওমরাহ, সুফি দরবেশ মিলায়া যে পরিমান লোক বাংলায় আসছে তার সংখ্যা অনেক। দিল্লীর সুলতান বোগরা খান এবং তুগলকি শাসনের সময় অত্যাচারের ভয়ে দিল্লী ছাইড়া বাংলায় পাড়ি জমায় বহু তুর্কি। পশ্চিম থাইকা আসা এইসব নবাগত বাসিন্দা, মুসলমান হওয়া বৌদ্ধ জ্ঞানসাধক ও মুসলমান হওয়া ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-কায়স্ত মিহলা গইড়া উঠে মুসলিম জনসমাজের নেতৃস্থানীয় দলটা। সঙ্গে থাকে ইসলাম গ্রহনকারী বিপুল পরিমাণ সাধারণ বৌদ্ধ, কিছু সাধারণ হিন্দু এবং বহু স্থানীয় সর্বপ্রানবাদী ধর্মের মানুষ। ফলে মুসলমান জনসমাজের গঠনেও ১০-১৫% শোষক আর ৮৫-৯০% শোষিতের বিন্যাস তৈয়ার হয়। এই বিন্যাসে সাধারণ, শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধের সংখ্যাই বেশি। কারণ আগের আলাপে বিভিন্ন সূত্র থাইকা দেখাইছি মুসলমান শাসন কায়েম হওয়ার সময় বাংলায় সবচেয়ে বেশি ছিল সর্বপ্রানবাদী স্থানীয় ধর্মের মানুষ, এরপর বৌদ্ধ, তারপর জৈন ও হিন্দু।

মধ্যযুগে মুসলমানরা সংখ্যায় বাড়লেও হিন্দু জনসংখ্যা তেমন কমে নাই, বরং বাড়ছে, ১৮৭২ সালের আদম শুমারি তার প্রমাণ। কিন্তু বৌদ্ধ, জৈন ও স্থানীয় প্রকৃতি ধর্মের মানুষ বাংলায় প্রায় নিশ্চিহ্ন বলা যায়। কাজেই সহজ হিসাবে পাওয়া যাইতেছে

যে, বৌদ্ধরাই দলবাইন্দু মুসলমান হইছে। আর তখনো টিইকা থাকা সর্বপ্রানবাদী ধর্মের আদি-অস্ট্রোলীয় মানুষ ইসলামে ধর্মান্তরিত হইছে। সেই তুলনায় হিন্দুরা মুসলমান হইছে কম। অন্যদিকে, জৈনরা সম্ভবত বেশিরভাগই হিন্দু হয়া গেছিল। তাই ইসলাম ধর্মের মানুষের পাশাপাশি হিন্দু ধর্মের লোকসংখ্যাও বাড়ছে। কাজেই, বাংলাদেশের মুসলমান জনসমাজের ঘরানার হিসাবটা হওয়া উচিত এইরকম: (আরব-ইরানী-তুর্কি-মধ্যএশীয় মুসলমান + বিপুল সংখ্যক বৌদ্ধ + হানীয় আস্ট্রিক ও মঙ্গল রঞ্জের উপজাতি + সেই তুলনায় কম সংখ্যক হিন্দু)। নিম্নশ্রেণির হিন্দু থাইকা মুসলমান হওয়া মানুষের হার বেশ কম। তবে প্রথম দিকে বৌদ্ধ ও সর্বপ্রানবাদী অস্ট্রিকরা মুসলমান হওয়ার পরের ধাপে, বাধীন সুলতানী ও মোগল আমলে বহু হিন্দু মুসলমান হইছে, পাশাপাশি ইসলামে ধর্মান্তরিত হইছে বাকি অস্ট্রিকদের বেশিরভাগই।

উপনিবেশি শাসন আমলে বৃটিশদের মুসলিম-বিরোধী মনোভাব এবং হিন্দুদের বৃটিশতোষন নীতির কারনে কলিকাতাকেন্দ্রিক হিন্দু সমাজের আর্থিক ও শিক্ষা-সংস্কৃতির উন্নতির কথা আমরা আগে আলোচনা করছি, যার ফলে উপরের সামাজিক বিন্যাসে হারাহারিটা পাল্টায়া যায়। সম্পদশালী ক্ষমতাবান মুসলমানদের হার ১০-১৫% থাইকা বেশ নিচে নাইমা আসে। লাখেরাজী সম্পত্তি বাজেয়াণ্ড হওয়ায় বহু মসজিদ-মন্তব্য-মাদ্রাসা-পাঠাগার দাতব্য প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়া যায়। জমিদারি হারায় অনেক মুসলমান। আর সেই সঙ্গে এইসব ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ সাধারণ মুসলমান হয় বর্গাচাষী অথবা নয়া নগরায়নের কায়িক শ্রমের উপরে বাঁচার পথ খুঁজে। এইভাবে বৃটিশ আমলে যে অসম অবস্থা তৈয়ার হয় সেইটা দেইখা অনেকে সেই নিরিখে মুসলমানদের হাজার বছরের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের আনুমানিক ইতিহাস লেখছেন, যা ভুল হইত বাধ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের আরেকটা কথা শেষে আনা দরকার। এমন এক কথা তিনি বলছেন যাতে তার চরিত্রটা পুরাই উদাম হয়া পড়ে। সেইটা হইল, 'নিম্ন শ্রেণির হিন্দুরা মুসলমান হইছে' এরচেয়ে শুরুতর তত্ত্ব বাংলার ইতিহাসে নাকি আর নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বলতে চাইছেন যে, কেবল নিম্ন-শ্রেণির হিন্দুরা মুসলমান হইছে- এই তত্ত্বটা হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস রচনার কাজে সবচেয়ে জরুরি বিষয়। বঙ্কিমচন্দ্রের কথার ইঙ্গিতটা খুবই বাজে, যার আড়ালে এইরকম একটা উক্ফনি থাইকা গেছে যে, এখন হিন্দুত্ববাদীদের উচিত এই তত্ত্ব প্রচার করা।

গত দেড়শ বছরের বাস্তবতাও তা-ই বলে। হিন্দুত্ববাদীদের এই বানোয়াট তত্ত্বই লেখা হইছে আমাদের ইতিহাসে, সমাজবিদ্যায়, ধর্মালোচনায়, পড়ার বইপত্রে, আর যুগের পর যুগ ধইয়া নতুন নতুন লেখকের লেখায় তার পুনরুৎপাদন চলছে। এখনো তা জারি আছে, আগের মতই। বাঙালির সঠিক নিরপেক্ষ ইতিহাস লেখতে হইল

প্রথমেই ইতিহাসবোধ ও ইতিহাসচর্চার বিষয়ডারে ধর্মীয় পুরানকাহিনী, ধর্মীয় লোককাহিনী, লোকসাহিত্য এইসব অন-এতিহাসিক জায়গা থাইকা একেবারে দূরে সরায়া আনতে হবে, যেমনটা করছেন শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ গৌড়রাজমালায়, কিংবা আবদুল করিম বাংলার ইতিহাস সুলতানী আমল বা বাংলার ইতিহাস মোগল আমলে। একই সাথে বিজ্ঞানমনক্ষতার দাবি আবার পুরাকাহিনী, লোককাহিনীরে ইতিহাস হিসাবে বিশ্বাস এক আজগুবি ও অসম্ভব মনস্তত্ত্ব, যা বেশিরভাগ বাঙালি ইতিহাসকারের মধ্যে আছে। তার অর্থ দাড়ায় তাদের বিজ্ঞানমনক্ষতার কথাটা পুরাই একটা ভাওতাবাজি। ইতিহাসের এইসব ভাওতাবাজি, উনিশ শতকের হিন্দুত্ববাদী চিন্তাভাবনা বা তার প্রতিক্রিয়ায় তৈরি ইসলামী মনোভঙ্গির আছর থাইকা মুক্ত করতে না পারলে বাঙালির সঠিক ও নিরপেক্ষ ইতিহাস কোনদিনই হবে না।

ছয়

আধুনিক কালে তথ্য বা জ্ঞান কোনটাই এক জায়গায় স্থির হয়া পইড়া থাকে না। সচরাচর তার তিনটা পরিনাম হয়। এক. মানুষের দরকারের নিরিখে বাতিল হয়া বিস্মৃতির খাতায় জায়গা নেয়, দুই. অথবা, প্রভাবশালী জ্ঞানভাষ্য হয়া সমাজে দাপটের সাথে টিইকা থাকে এবং যুগে যুগে পুনরুৎপাদিত হইতে থাকে, নতুবা, তিনি। সঠিক হওয়া সত্ত্বেও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কারসাজিতে প্রভাবশালী জ্ঞানভাষ্যের সাথে ধাক্কাধাকি কইরা তার তলে চাপা পইড়া সময়ের একটা খাঁজে আটকায়া যায় এবং তার আর পুনরুৎপাদন হয় না বইলা বিস্মৃতির খাতায় জমা হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এই প্রক্রিয়ায় মূল ভূমিকা পালন করে প্রচার মাধ্যম আর রাষ্ট্রীয় শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান।

সমস্যা হয়, এই প্রক্রিয়াটায় যখন কেউ হাত চুকায়া তার গতিপথ বদলায়া দিতে চায়। আধুনিক যুগে এই কাজটাই করে প্রচার মাধ্যম ও সরকারী শিক্ষা-সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানগুলি। জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বাইড়া যাওয়ায় এবং মানুষের অনেক বন্ধনগত চাহিদা তৈয়ার হওয়ায় অধিকাংশ লোক তার চাহিদা মিটানোর ধান্ধায় সারাক্ষণ দৌড়ের উপ্রে থাকে। তথ্য, তার তাফসির ও চূড়ান্ত জ্ঞানের জন্য তার গবেষনা করার সময় নাই, দরকারও নাই। এগুলার জন্য সে নির্ভর করে প্রচার মাধ্যম ও ছাপা বইয়ের উপ্রে। এর ফলে প্রচার মাধ্যম ও ছাপা বইয়ের যে ক্ষমতা তৈয়ার হইল সেইটা দিয়া সে মিথ্যা তথ্যের সত্য হিসাবে দেখাইতে পারে, আবার সত্যের মিথ্যা

বা অদরকারী বা দেশবিরোধী হিসাবে দেখায়া দিতে পারে। বানোয়াট ইতিহাসের আপাতত পরিনত করতে পারে সত্য ইতিহাসে। কোন বানোয়াট তথ্য বা জ্ঞান বা খন্দ জ্ঞান বা বিবরণ একবার ছড়ায় দিতে পারলে তা সমাজের ও কালের এক স্তর থাইক ছুইয়া পরের স্তরে রঙ ছড়ায় এবং নিজে নিজেই চলতে থাকে ভবিষ্যতের দিকে।

বাঙালির ইতিহাসের যে চাইরটা পক্ষপাতদুষ্ট দিক নিয়া আলাপ করলাম সেইগুলা নিয়া ঠিক এইটাই হইছে। পুরা উনিশ শতক জুইড়া প্রচার মাধ্যম, ইস্কুলকলেজে পড়ার বই লেখা ও ছাপানো, স্কুল কলেজগুলার পরিচালনা, ইত্যাদি ছিলো নেতৃত্বানীয় হিন্দুদের কজায়, যার ক্ষমতাশালী অংশটা ছিল হিন্দুত্ববাদী। এদের তৎপরতায় এই চারটি বিষয়ও তথ্য, ইতিহাস ও জ্ঞান আকারে ছড়ায় পড়ছে সমাজে। পরের যুগের মানুষ ইতিহাস লেখতে আইসা সামনে পাইছে এইসব বই ও পত্রিকা। তারাও আবার ইতিহাস লেখছে এইগুলার বরাত দিয়া, যে ইতিহাসে সত্য হিসাবে জায়গা কইয়া নিছে পক্ষপাতদুষ্ট বয়ানগুলা। এইভাবে পুনরুৎপাদন চলছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধইয়া।

সাধারণ মানুষ ইতিহাসের পড়ুয়া মাত্র। এর সত্য মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য দরকারী গবেষণা করার সময় বা আগ্রহ কিংবা দক্ষতা তারার নাই। তারা মনে করে, যে ইতিহাস যুগে যুগে একাধিক লেখক একইভাবে উপস্থাপন করছেন তা নিশ্চয় সত্য ইতিহাস। হিন্দুত্ববাদী ইতিহাস প্রকল্পের বানোয়াট বিবরণগুলার ক্ষেত্রে এইটাই ঘটছে। এর কোন কোনটা এখন পড়ুয়াদের কাছে সাধারণ সত্যের মর্যদা পায়া গেছে, যদিও তা দাঁড় করানো হইছিলো একেবারেই ভূয়া অনুমানের উপর।

আজ প্রায় দেড়শ বছর পরে সাধারণ পড়ুয়ার পক্ষে বুঝা সম্ভব না যে এইগুলা বানোয়াট জ্ঞান। তারা জানতে পারবেন না কখন কোন উক্ফানিতে তৈরি হইছিল এইসব। তাই সাধারণ পড়ুয়ারা এইগুলারে সত্য ইতিহাস বইলা মাইনা নিছে। আর, যুগে যুগে আমাদের তথ্যকথিত বুদ্ধিজীবী লেখকরা এইসব বানোয়াট ইতিহাসেই আবার নিজের মত কইয়া লেইখা জন্য দিছে আরো কিছু বইয়ের।

আরেকটা সমস্যা। পড়া, চিন্তাভাবনা ও গবেষনার দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকলেই ইতিহাস লেখায় হাত দেয়া উচিত। কিন্তু গত তিরিশ-চলিশ বছরে এমন অনেক লেখক গজাইছেন যাদের কাছে ইতিহাস লেখা হইল অবসর যাপনের মত। তাই অবসরপ্রাপ্ত ব্যবসায়ী, আমলা, বিচারক, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা, পুলিশ কর্মকর্তা, সামরিক কর্মকর্তা, এমনকি পেশাদার চিটার-বাটপারও বাঙালির ইতিহাস লেইখা ফেলতেছেন, যদিও এই বিষয়ে দরকারী গবেষনা ও পড়াশোনার সময় তাদের থাকার কথা না। কাজেই তাদের ইতিহাস লেখার অর্থ দাড়ায় সমাজে জারী থাকা

জ্ঞানভাষ্যের বিবরণগুলারে আবার নিজের মত কইরা সাজায়া একটা বই লেখা, যেটারে পুনরুৎপাদন বলা হয়। এইভাবে ইতিহাসের বিভিন্ন বয়ানের অনেক পুনরুৎপাদন হইছে, এখনো হয়। এর ফলে প্রজন্মাভিত্তিক বইপত্রের সমর্থন পায়া পক্ষপাতদুষ্ট আনুমানিক বয়ানগুলাই সমাজে সবচেয়ে জোরদার জ্ঞানভাষ্য হিসাবে টিইকা থাকে। আর তার থাইকা আনুমানিক ইতিহাসের বয়ান ধীরে ধীরে ছড়ায় পড়ে স্কুল, কলেজ, পত্রপত্রিকা, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন, লাইব্রেরী, আর তার মাধ্যমে গোটা জনমানসে।

এখন কথা হইল, যিনি ইতিহাস লেখার উদ্দেশ্য নিয়া পড়াশোনা করতে যাবেন তার সামনে প্রথমেই আসবে এই বানোয়াট ইতিহাসের পাহাড়। আসল কথা উদ্ধারের জন্য তারে যাইতে হবে এর গভীরে। কিন্তু তিনি যতই গভীরে যাইবেন সেইখানে আগের যুগের আরো স্তর রয়া গেছে পুনরুৎপাদিত বইপত্রের, তারপর আরো এবং আরো। তিনি সহজে আসল ইতিহাসের কাছে পৌছাইতে পারবেন না। সঠিক ইতিহাস চর্চার পথে এইটা হইল সবচেয়ে বড় কাঁটা। বস্তুনিষ্ঠ ইতিহাস লেখতে হইলে আমাদেরকে অইসব বানোয়াট ইতিহাসের বহু বইপত্রের অনেকগুলো স্তর পার হয়া পৌছাইতে হবে গোড়ার দিকে, ঠিক যেইখানে এই আবর্জনা চাফের সূচনা সেই জায়গায়। নাইলে আত্মবিরোধী, অজ্ঞাতিবিরোধী, রঙচোরা আনুমানিক ইতিহাসের পথেই আটকা পইড়া থাকতে হবে যুগের পর যুগ।

তথ্যের জন্য ব্যবহৃত বাংলা ইংরেজি বইয়ের তালিকা:

ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা, বাঙালার ইতিহাস, বাইশতম সংস্করণ, সংকৃত্যক্ত্ব, কলিকাতা, ১৯৩৫।
(ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঈশ্বরচন্দ্র শর্মা নামে লেখতেন)।

কেদারনাথ মজুমদার, ময়মনসিংহের ইতিহাস ও ময়মনসিংহের বিবরণ, জেলা পরিষদ, ময়মনসিংহ, ১৯৮৭।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙালার ইতিহাস সমক্ষে কয়েকটি কথা', বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয়খন্ড), বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদক- সুবোধ চক্রবর্তী, কামিনী প্রকাশলায়, কলিকাতা, ভারত, ১৯৯১।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, 'বাঙালার ইতিহাস', বিবিধ প্রবন্ধ (দ্বিতীয়খন্ড), বঙ্কিম রচনাবলী দ্বিতীয়খন্ড, সম্পাদক সুবোধ চক্রবর্তী, কামিনী প্রকাশলায়, কলিকাতা ১৯৯১।

ডক্টর নীহাররঞ্জন রায়, বাঙালীর ইতিহাস আদিপর্ব, (সুভাষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংক্ষেপিত সংস্করণ), নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬০।

বাংলা দেশের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড (মধ্যযুগ), সম্পাদক: শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার, পরিবর্তিত দ্বিতীয় সংস্করণ, জেনারেল প্রিন্টার্স এন্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ১৩৮০।

ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস (পাচীনযুগ) প্রথমখন্ড, এম সরকার পাবলিশিং এণ্ড কোং, কলিকাতা ২০০৬-৭।

ডক্টর এম. এ. রহিম, বাংলার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস (অনু. আসাদুজ্জামান), বাংলা একাডেমী, ১৯৮২।

নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (প্রথমভাগ ব্রাহ্মণকাণ্ড প্রথমাংশ), বিশ্বকোষ প্রেস, কলিকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩১৮।

নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (রাজন্যকাণ্ড, কায়স্ত্রকাণ্ডের প্রথমাংশ), বিশ্বকোষ প্রেস, কলিকাতা, ১৩২১।

নগেন্দ্রনাথ বসু, বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস (দক্ষিণরাজ্য কায়স্ত্রকাণ্ড প্রথমখণ্ড), বিশ্বকোষ প্রেস, কলিকাতা, ১৩৪০।

প্রেমময় দাশগুপ্ত, হিউয়েন সাঙ্গের দেখা ভারত, অরিত্র ঢাকা, ২০১৬।

মৃত্যুঞ্জয় শর্মা, রাজাবলী, প্রকাশক শ্রীবিহারীলাল চট্টোপাধ্যায়, পঞ্চম সংস্করণ, কলিকাতা, ১৮৮৯।

রমিলা ধাপার, 'সাম্প्रদায়িকতা ও প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা', অনু: তনিকা সরকার অরাজ, <https://www.auraj.net/romila-thapar/3163/>, ৩১ মে ২০২১।

শ্রীদেবেন্দ্র কুমার ঘোষ, প্রাচীন বাঙালা সাহিত্যের প্রাঞ্জল ইতিহাস, মডার্ন বুক, কলিকাতা, ১৯৫৯।

শ্রীদুর্গাচন্দ্র স্যান্যাল, বাঙালার সামাজিক ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯০৮।

শ্রীনিখিলনাথ রায়, মুর্শিদাবাদ-কাহিনী, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং কোং, কলিকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩১৬।

শ্রীরঞ্জনীকান্ত চক্ৰবৰ্ত্তি, গৌড়ের ইতিহাস: (হিন্দু রাজত্ব) প্রথমখন্ড, রংপুর সাহিত্য পৰিষৎ, ১৩১৭।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙালার ইতিহাস প্রথমখন্ড, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, পুনৰ্বিন্যস্ত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০২।

শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, বাঙালার ইতিহাস দ্বিতীয়খন্ড, দেজ পাবলিশিং, কলিকাতা, পুনৰ্বিন্যস্ত দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৪০২।

শ্রীরাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, বাঙালার ইতিহাস, জে জি চ্যাটোর্জি এন্ড কো, কলিকাতা, চতুর্দশ সংস্করণ, ১৮৭৯।

Charles Stewart, *The history of Bengal, From the First Mohammedan Invasion until the Virtual Conquest of that Country by the English AD 1757*, Black Parry and co., London, 1813.

Dinesh Chandra Sen, *History of Bengali Language and Literature*, University of Calcutta, 2nd Edition, 1954.

H. Beverly, *Report on the Census of Bengal 1872*, Bengal Secretariat Press, Calcutta, 1872.

Rammohon Roy, *The English Works of Raja Rammohun Roy* (Ed. Jogendra Chunder Goshe), Vol-I, Bhabanipur Oriental Press, Calcutta, 1885.

Richard M. Eaton, *The Rise of Islam and the Bengal Frontier*, University of California, USA, 1993.

Kun-dga'-snying-po (Lama Taranath), *History of Buddhism in India* (trans: Lama Chimpa, Alaka Chattopadhyaya, Ed. Debiprasad Chottopadhyaya) Motilal Banarshidass Publishers Pvt Ltd, Delhi, Reprinted, 1990.

NK Bhattacharya, *Coins & Chronology of Early Independent Sultans of Bengal*, Heffer & Sons, England, 1922.

Witzel, Michael, 'Indocentrism: Autochthonous Visions of Ancient India', in Edwin F. Bryant & Laurie L. Patton (eds.), *The Indo-Aryan Controversy. Evidence and inference in Indian history*, Routledge. 2005.

David Cameron, 'Genetics Proves Indian Population Mixture', Harvard Medical School

website, <https://hms.harvard.edu/news/genetics-proves-indian-population-mixture>, August 8, 2013.

James Legge, *A Record of Buddhistic Kingdoms by Chinese Monk Fa-Hien* (digital version), Buddha Dharma Association Inc. (https://www.buddhanet.net/pdf_file/rbdddh10.pdf).

Poznik GD, Xue Y, Mendez FL, Willems TF, Massaia A, Wilson MA, et al., *Punctuated Burst in human Male Demography Inferred from 1244 Worldwide Y-Chromosome Sequence*, *Nature Genetics*. 48(6) 2016. P-593-599.

Xiao Z, Khan F, Borker M, Herrera R, Agrawal S, *Presence of Three Different Paternal Lineage Among North Indians: A study of 560 Y Chromosomes*, *Annals of Human Biology*. 36 (1), 2009. 46-59.

=

→



ফয়েজ আলমের চিত্তার ধরণ ও রোখ প্রচলিত সাহিত্য ধারা থেকে ভিন্ন। আমাদের মনোজগতে উপনিবেশি প্রভাব চিহ্নিতকরণ ও কাটিয়ে উঠার কৌশল রচনা করে এবং বাস্তি ও সমাজের উপর নানামুখি হেজেমনির রূপ ও উৎস চিনিয়ে দিয়ে তিনি আমাদেরকে স্বাধীন চিত্তার পথে এক ধাপ এগিয়ে দেন।

কবি, প্রাবন্ধিক, উত্তরউপনিবেশি তাত্ত্বিক ফয়েজ আলমের জন্য নেতৃত্বে জেলার আটপাড়ার যোগীরনগুয়া গ্রামে। বাবা মরহুম শেখ আবদুস সামাদ, মা সামসুন্নাহার খানম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে বিএ (সমান) ও এমএ পাশ করার পর প্রাচীন বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক গবেষণার জন্য এমফিল, ডিপ্রী লাভ করেন। দুই যুগের বেশি সময় ধরে লিখছেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ:

প্রবন্ধ: বাঙালি সমাজ ও সংস্কৃতি (২০০৪),
উত্তর-উপনিবেশি মন (২০০৬), ভাষা, ক্ষমতা
ও আমাদের লড়াই প্রসঙ্গে (২০০৮), বুদ্ধিজীবী,
তার দায় ও বাঙালির বুদ্ধিবৃত্তিক দাসত্ব
(২০১২), ভাষার উপনিবেশ: বাংলা ভাষার
ক্লাপাত্তরের ইতিহাস (২০২২); কবিতা: ব্যক্তির
মৃত্যু ও খাপ-খাওয়া মানুষ (১৯৯৯); জলছাপে
লেখা (২০১৭), রাইতের আগে একটা গান
(২০২২);, আমারে উড়াও ধূলা (২০২৩);
অনুবাদ ও সম্পাদনা: এডওয়ার্ড সাইদের
অরিয়েন্টালিজম (২০০৫); কাভারিং ইসলাম
(২০০৬), জ্যাক দেরিদা: পাঠ ও বিবেচনা
(২০০৮), এডওয়ার্ড সাইদের নির্বাচিত রচনা
(২০১২)।

প্রচ্ছদ: ইতান রেহান